ধর্মকারী
dhormockery

নিবেদিত

নরসুন্দর মানুষ

নির্মিত

ইসলামে বর্বরতা

নারী অধ্যায়

আবুল কাশেম

ইসলামে বর্বরতা

নারী অধ্যায়

আবুল কাশেম

একটি ধর্মকারী ইবুক

www.dhormockery.com
www.dhormockery.net
dhormockery@gmail.com

ইসলামে বর্বরতা

নারী অধ্যায়

আবুল কাশেম

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারী, ২০১৭

ধর্মকারী ইবুক

প্রকাশক
ধর্মকারী
ঢাকা,
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ
নরসুন্দর মানুষ

ইবুক তৈরি
নরসুন্দর মানুষ

মূল্য: ইবুকটি বিনামূল্যে বন্টন করা যাবে।

Islame Borborota, Nari Oddhay, by Abul Kashem
First Edition: January, 2017
Published by: Dhormockery eBook
Dhaka, Bangladesh.
eBook by: NoroSundor Manush

সূচিপত্র

{সূচিপত্র ইন্টারঅ্যাকটিভ লিংক যুক্ত; **পর্ব নম্বর** লেখায় মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি পর্ব-পৃষ্ঠায় চলে যাওয়া যাবে, সেই সাথে **পর্ব-পৃষ্ঠার টাইটেলে** মাউস পয়েন্টার দিয়ে সরাসরি সূচিপত্রে আসা যাবে}

মুখবন্ধ

প্রায় দশ বছর পূর্বে, যখন আমি সবে মাত্র লেখা শুরু করেছিলাম তখন 'উইমেন ইন ইসলাম' নামে একটা ছোট বই লিখেছিলাম। এই লেখা মুক্তমনায় খোঁজ করলে হয়ত আজও পাওয়া যেতে পারে। বইটি পরে আমেরিকার এক অনামা প্রকাশক প্রকাশও করেছিল–যদিও এখন বইটি আউট অব প্রিন্ট। এই বইয়ের এক পাঠক বইটির বাংলা ভাবানুবাদ করার দায়িত্ব নেন। পরে তিনি 'উইমেন ইন ইসলামের' ছায়া অবলম্বনে **'ইসলামে বর্বরতা'** নামে একটা বই লিখায় উদ্যোগী হোন। এই বইয়ের প্রথম অধ্যায় হয় 'নারী অধ্যায়' যা 'উইমেন ইন ইসলামের' উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়।

দুঃখের বিষয়, ঐ পাঠক নানা কারণে মাঝ পথে **'ইসলামে বর্বরতা'** বইটির লেখা বন্ধ করে দেন। তা আজ প্রায় দশ বছর হতে চলল। অনেকদিন পর আমি পুরানো নথিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আবার হঠাৎ ঐ অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটা আবিষ্কার করলাম। আমি কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জিত করে ঐ লেখকের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে আপাতত: নারী অধ্যায়টুকুই সম্পন্ন করব। সময় পেলে অন্য অধ্যায় সমাপ্ত করার ইচ্ছে রাখলাম।

নিরাপত্তার কারণে আমি ঐ লেখককে XXXX নাম দিয়েছি।

এই লেখার অনেক অংশ XXXX এর লিখা। আমি কিছু নিজে লিখেছি ও কিছু অংশ পরিবর্তন করেছি। যেহেতু এই লেখাটা অনেক পুরানো–কাঁচা হাতের, তাই ভুলভ্রান্তি

থাকতে পারে। এ ব্যাপারে পাঠক যদি ভুলভ্রান্তি আমার দৃষ্টিতে আনেন তবে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

দশ বছর আগে ইসলামের সমালোচনা করে বাংলায় লেখা পাওয়া দুষ্কর ছিল। আজ সেই পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক লেখক আজ কলম ধরেছেন ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করে। আমি তাদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই রচনা এই সব নির্ভীক বাঙ্গালি তরুণ লেখকদের প্রতি নিবেদিত।

বাংলায় লেখার দক্ষতা আমার অতি নিম্নমানের। তাই পাঠকের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

আবুল কাশেম
ফেব্রুয়ারি ৬, ২০১১

(**বিঃ দ্রঃ** এই লেখার বাংলা কোরান ছাড়া আর সব উদ্ধৃতির অনুবাদ লেখকের)

সূচনা

সব বাংলাদেশীর মত আমিও ইসলামকে খুবই শান্তির ধর্ম মনে করতাম, সবার মতই আসল ইসলাম সম্বন্ধে জানতাম অল্পই। ইরানে ইসলামী হুকুমত কায়েমে দুনিয়া তার দিকে ফিরে তাকাল। পরে আমিও কৌতূহলী হয়ে ঢুকে পড়লাম ইন্টেরনেটে। ইউরোপ-আমেরিকার শত শত ইসলামী মনীষীর অসংখ্য লেখা পড়ে মনটা খুব খুশী হয়ে গেল। সব সরল পাঠকের মত আমিও তাদের প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করলাম। ইসলামে আমাদের মা-বোনদের জন্য এত ভালো ভালো কথা আছে যে, তা দেখে মনটা আমার বড়ই মোহিত হয়ে গেল।

কিন্তু তারপর পৃথিবীর মুসলিম দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সন্দেহ হল। ইসলামী মনীষীরা এত জোর দিয়ে যা কিছু বলছেন, তার দেখি কিছুই মিলছে না। উল্টো বরং মেয়েদের আর্তনাদে সেখানে কান পাতা দায়। পাকিস্তানে, নাইজিরিয়াতে, আফগানিস্তানে তো মোটামুটি ইসলামী আইন (শারিয়া) চালু আছে, কিন্তু তাহলে সে সব দেশে মেয়েদের অবস্থা এত করুণ কেন? আফগানিস্তানের রাস্তায় পুলিশ লাঠি দিয়ে মেয়েদের পেটাচ্ছে, নাইজিরিয়ায় ধর্ষিতা মেয়ে পুলিশের কাছে নালিশ জানাতে এসে শারিয়া কোর্টে মৃত্যুদণ্ড পেল, দুবাই কোর্ট স্বামীদেরকে বৌ-পেটানোর অধিকার দিল, পত্রিকায় এই সব দেখে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল, আতংকে ত্রাসে শিরশির করে উঠল বুকের ভেতর। সর্বনাশ! অন্য কেতাবে যা-ই লেখা থাকুক, শারিয়ার কেতাবে তো

এগুলোই আছে। বাংলাদেশেও শারিয়া চালু করার চেষ্টা চলছে, এমন ঘটলে আমাদের যে কী সর্বনাশ হয়ে যাবে, তা ভেবে ভয়ে হিম হয়ে গেল বুক। তারপর বাধ্য হয়েই ঢুকে পড়লাম ইসলামের ভেতর। ওখানে কী আছে, দেখতে হবে, শেকড় খুঁজে বের করতে হবে নারীর ওপর ইসলামী অন্যায়-অত্যাচারের। অত্যাচারগুলো আসলে কি কেতাবেই আছে, না কি আইনগুলোকে পুরুষরা বিকৃত করেছে?

যা দেখলাম, তাতে দম বন্ধ হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য, এ যে অবিশ্বাস্য! এ কী চেহারা আসল ইসলামের? এ যে প্রকাণ্ড এক দানব ছাড়া আর কিছু নয়! আবার সব কিছু দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। না, কোনো ভুল নেই, মানুষকে হাজার বছর ধরে নির্লজ্জ মিথ্যে কথায় কঠিন প্রতারণা করেছেন মওলানারা। আমি উচ্চ বিদ্যায়তনে ছাত্র পড়াই, জীবনে অনেক পরীক্ষাই দিয়েছি এবং পাশ করেছি। এবার যেন জীবনের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে, এ কথা মনে রেখে আবার পড়া শুরু করলাম ইসলামের মূল বইগুলো, যেখান থেকে উঠে এসেছে ইসলামের আইনকানুন। খাটাতে শুরু করলাম নিজের বিবেক-বুদ্ধি আর কল্যাণবোধ। তখন ধীরে ধীরে ইসলামের এই লুকিয়ে রাখা না-বলা দানবীয় দিকটা স্পষ্ট হয়ে এল চোখের সামনে। না, কোনো ভুল নেই। নারীর প্রতি ইসলামের আদর-সম্মান শুধু লোক দেখানো, মন-ভোলানো। ওগুলো শুধু গজদন্তের মত হাতীর বাইরের সুন্দর দাঁতটা। আসলে ইসলামের মুখের ভেতরে লুকোন আছে মেয়েদের চিবিয়ে খাওয়ার জন্য আরও একপাটি শক্তিশালী বিষাক্ত দাঁত। তারই নাম শারিয়া।

কিন্তু এটা আমি একা দেখলে তো চলবে না। অবশ্যই এ লুকোনো দলিল দেখতে হবে পৃথিবীর সব মানুষকে। যত অবিশ্বাস্যই হোক, যত বেদনাদায়কই হোক, সবাইকে জানতেই হবে ইসলামী শারিয়ার আইন কি শকুনের চোখে তাদের দেখে। খাল কেটে এ রক্তপিপাসু কুমীরকে ডেকে আনবার আগে অবশ্যই সমস্ত শান্তিপ্রিয় মুসলমানকে দেখতে হবে ইসলামের এই ভয়াবহ লুকোনো চেহারা।

তাই হাতে তুলে নিয়েছি কলম, খুব আস্তে-ধীরে ইসলামের আসল চেহারাটা ফুটিয়ে তুলব আপনাদের সামনে। আপনারা পড়ুন, খুঁটিয়ে দেখুন এবং চিন্তা করুন। এবং দেখান মওলানাদের। তাঁদের কী বলার আছে, জানান আমাকে। যদিও জানি, তাঁরা টুঁ শব্দটি করবেন না। কারণ তাঁদের ভালোই জানা আছে যে, লড়াইটা তাঁদের করতে হবে আমার বিরুদ্ধে নয়, বরং তাঁদের নিজেদের কেতাবের বিরুদ্ধেই। এটাও তাঁরা ভালোই জানেন যে, এ ব্যাপারে বেশি নড়াচড়া করলে তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যের চোরাবালুর গর্তে ঢুকে মারা পড়বেন।

ধন্যবাদ।

আবুল কাশেম।

প্রথম পাঠ

প্রথমে কোরান দিয়েই শুরু করা যাক, সৌদী আরব থেকে প্রকাশিত মওলানা মুহিউদ্দিন খানের অনুবাদ। কোরানের যে কথাগুলো পুরুষের মন মানসিকতায় ব্রহ্মাস্ত্র হিসেবে গেঁথে রয়েছে, সেগুলো একটু দেখে নেয়া যাক, তারপরে বিস্তারিত তথ্যে যাব আমরা।

আল্লাহ্‌র পছন্দ হচ্ছে পুরুষ—তা কি বলার দরকার রাখে?
কী আছে সুরা নাহল- আয়াত ৪৩ (১৬:৪৩), সুরা হজ্ব আয়াত ৭৫ (২২:৭৫) এ?

নারীকে কোনদিন নবী-রসুল করা হবে না।

সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০৯-(১২:১০৯) তেও একই কথা:

আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসুল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে, আমি তাঁদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম।

এবং সিদ্ধান্ত দিয়েছে সুরা আল্‌ আনাম আয়াত ৯ (৬:৯):

যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসুল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করছে।

কোনো কোনো অনুবাদে দেখবেন, আরবীর ‘পুরুষের আকারে’ শব্দটাকে অনুবাদে ‘মানুষের আকারে’ বলে সমস্যাটাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করেছেন চালাক মওলানারা।

আরবীতে মানুষ হল ইনসান আর পুরুষ হল রাজাল। মওলানাদের জিজ্ঞাসা করুন তো, কোরানে কোন শব্দটা আছে?

এবারে একটু হাদিস ঘেঁটে দেখা যাক। হাদিস হল নবী (সঃ) -এর কথাবার্তা, আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা, ব্যবহার-ব্যক্তিত্ব, মতামত-সিদ্ধান্ত, এ সবের বিস্তারিত রিপোর্ট, যা তাঁর সহচরেরা দিয়ে গেছেন। হাদিস ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, কোরানের পরেই এর স্থান। হাদিস বাদ দিলে ইসলামের সাংঘাতিক অঙ্গহানি হয়ে যায়। বিখ্যাত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম তাঁর বিখ্যাত “হাদিস সংকলনের ইতিহাস” বইয়ের ৯৪ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন বুলন্দ ইমামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ‘হাদিস অমান্যকারী - কাফির।'

ছয়টি হাদিসের বই সর্বকালে সর্ব দেশে সুন্নী মুসলমানেরা “সহিহ্” বা “সত্য” বলে গণনা করেন, সেগুলো হল: সহিহ্ বোখারি, সহিহ্ মুসলিম, সহিহ্ নাসায়ী, সহিহ্ তিরমিজি, সহিহ্ আবু দাউদ এবং সহিহ্ ইবনে মাজাহ। আমরা মোটামুটি সেগুলো থেকেই উদ্ধৃতি দেব।

দুনিয়ার এক হাজার দুশো মিলিয়ন মুসলমানের মধ্যে সুন্নীরা-ই এক হাজার কোটি। হাদিসে মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক ভালো কথাও আছে। কিন্তু তার পাশাপাশি যা আছে, তাতে লজ্জায় মুসলমান পুরুষদের স্রেফ আত্মহত্যা করা ছাড়া অথবা ওই শত শত দলিলগুলোকে খুন করা ছাড়া উপায় নেই। বাড়িয়ে বলছি না একটুও, সবই দেখাব একটা একটা করে।

সহিহ্ মুসলিম, বই ৩১ হাদিস ৫৯৬৬:

আবু মূসার বর্ণনা মতে নবী (দঃ) বলেছেন: "পুরুষদের মধ্যে অনেকেই ত্রুটিমুক্ত কিন্তু নারীদের মধ্যে কেউ-ই ত্রুটিমুক্ত নয়, কেবল ইমরানের কন্যা মেরী এবং ফারাওয়ের স্ত্রী আয়েশা ছাড়া।"

হল? একেবারে সাফ কথা। এ কথার পর কি আর কিছু বলার থাকতে পারে, না বলা উচিত? এর পরেও আবার যদি গোদের ওপর বিষফোঁড়া গজায়, ইসলাম যদি পতিদেবতাকে ওপরে তুলতে তুলতে একেবারে আসমানী পাতি-দেবতা করে তোলে, তবে নারী তো পুরুষের পায়ের তলায় পিষে যাবেই, তার জন্মগত মানবাধিকারও লেজ তুলে পালাবেই।

প্রমাণ দেখাচ্ছি সুনান আবু দাউদ হাদিস থেকে; বই ১১ হাদিস নম্বর ২১৩৫:
কায়েস ইবনে সা'দ বলছেন, "নবী (দঃ) বললেন: "আমি যদি কাউকে কারো সামনে সেজদা করতে বলতাম, তবে মেয়েদের বলতাম তাদের স্বামীদের সেজদা করতে। কারণ আল্লাহ স্বামীদের বিশেষ অধিকার দিয়েছেন তাদের স্ত্রীদের ওপরে।"

গ্রাম-গঞ্জের কোটি-কোটি অশিক্ষিত মুসলিম পুরুষ আর কিছু না বুঝুক, আল্লার দেয়া এই "বিশেষ অধিকার" ঠিকই বুঝেছে, আর তার ঠ্যালায় মেয়েদের যে কী অপমান আর নৃশংস অত্যাচার সইতে হয়েছে শতাব্দী ধরে, তা ঠিকমত উপলব্ধি করলে অশ্রু সামলানো যায় না।

এ ঘটনাটা ঘটেছিল হিন্দুধর্মের বইতেও। হিন্দুরা তো তাদের মহাপুরুষদের অক্লান্ত চেষ্টায় সে নরক থেকে বেরিয়ে এসেছে, শুধু আমরা মুসলমানরাই এখনো চোখে সর্ষে ফুল দেখে দেখে ভির্মি আর খাবি খেয়ে চলেছি এ অন্ধকুপের ভেতর। মেয়েদের আর্তনাদ শুনছি আর সাম্যের বক্তৃতা শুনছি। অবশ্যই, অবশ্যই!

সে কথাগুলো হল: পুরুষ নারীর ওপরে কর্তা, উত্তরাধিকারে পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাবে, আর্থিক লেনদেনে নারীর সাক্ষ্য পুরুষের অর্ধেক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নারীরা হল ভূমি এবং ক্রীতদাসী সদৃশ—এও কি বলে দিতে হবে? দেখুন কোরান শরীফ:

সুরা বাকারা, আয়াত ২২৩ (২:২২৩):
তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শষ্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।

এ কথার মানে কী? 'শষ্যক্ষেত্র' কথাটার মানেই হল, মেয়েদের বিছানায় টেনে নিয়ে যাও, আর 'চাষ কর', 'শষ্য', অর্থাৎ বাচ্চা পয়দা করার জন্য। ছিঃ! কোনো ধর্মগ্রন্থ যে নারীদের নিয়ে এমন অবমাননাকর শব্দ উচ্চারণ করতে পারে, তা কল্পনাই করা যায় না। আর 'ব্যবহার কর' কথাটার মানেই বা কি? মেয়েরা কাপড়, না জুতো যে ব্যবহার করতে হবে? এর পরেও কোরানে পুরুষের জন্য মেয়েদের 'উপভোগ কর', 'সম্ভোগ কর' এ ধরনের কামুক কথাবার্তা প্রচুর আছে। আর বেহেশতের তো কথাই নেই।

সুরা আল-ওয়াক্বিয়াতে (সূরা ৫৬: ৩৫-৩৭) মেয়েদের নানারকম উত্তেজক বর্ণনার পর বলা হল:
আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা।

এদিকে বেচারা অনুবাদকের হয়ে গেল মহা মুশকিল। রমণীর সাথে রমণের লোভটাই সবচেয়ে আকর্ষনীয়, কিন্তু একবার রমণ হয়ে গেলে রমণীর পক্ষে চির কুমারী থাকাটাও অসম্ভব। কী করা যায়! অনেক ভেবে-চিন্তে মাথা চুলকে তিনি ব্যাখ্যার অংশে লিখলেন: জান্নাতের নারীদের এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে (পৃ-১৩২৭, কোরাণের বাংলা অনুবাদ মওলানা মুহিউদ্দীইন খান) । শুধু তা-ই নয়, ঐ একই পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে: এ ছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি

ভোগবিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। অর্থাৎ নারী শুধু শয্যা ও লাঙ্গল করার ভূমি মাত্র।

সাব্বাশ!

এইসব কথা বলার পরে প্রচুর মিষ্টি মিষ্টি কথা কিংবা 'আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক''' এসব বলে কোনোই লাভ হয়নি, মুসলমান মেয়েরা চিরকাল পিষ্ট হয়েছে পুরুষদের পায়ের নীচে।

এগুলোই হল প্রাথমিক পাঠ। এবার আসা যাক দীর্ঘ আলোচনায়।

নারীরা যে একেবারেই নিকৃষ্ট তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?

এবার শুরু করা যাক বিস্তারিত আলোচনা।

সুরা বাকারা, আয়াত ২২৮ (২:২২৮):
আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর, নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

এই হল শুরু। পরস্পরের ওপর এই অধিকারটা যে কত প্রকার ও কী কী, তা পরিষ্কার করে পুরো কোরানের কোথাও কিচ্ছু বলা হল না বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বটা ঠিকই খামচে ধরল পুরুষ, একেবারে চিরকালের জন্য। যাহোক, মেয়েদের যে অধিকার বলে একটা পদার্থ আছে, তার স্বীকৃতি একটুখানি হলেও পাওয়া গেল এখানে। পয়গম্বর হয়ত চেষ্টা করেছিলেন মেয়েদের কিছুটা হলেও অধিকার দিতে, কিন্তু সম্ভবত সেই বেদুঈন পুরুষদের শত শত বছরের প্রতিষ্ঠিত একচেটিয়া ক্ষমতার সমাজে উল্টো প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনায় তিনি এ ব্যাপারে ধুম-ধাড়াক্কার কোনো বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে চান নি।

এবারে সুরা নিসা, আয়াত ৩৪ (৪:৩৪):
পুরুষরা নারীর উপর কর্তৃত্ব শীল। এ জন্য যে আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার

স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাজত যোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে। আর যাদের মধ্যে আবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান করোনা।

না, আর কোন রাখা-ঢাকা নেই, পুরুষের কর্তৃত্বশীলতা বলেই দেয়া হল এখানে। যে কর্তৃত্ব করে, আর যার ওপরে কর্তৃত্ব করা হয়, এ দু'জন কখনো সমান হয় না, হতে পারে না। পুরুষকে কোরান এই কর্তৃত্ব দিল স্পষ্ট ভাষায় সম্ভবত টাকা-পয়সার এবং শারীরিক শক্তির কারণেই। কিন্তু শারীরিক শক্তি কোনো যুক্তিই হতে পারে না। তাহলে আফ্রিকার জঙ্গলের গরিলাই হত মহান আশরাফুল মাখলুকাত, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কিংবা হাতী বা তিমি মাছ। টাকা-পয়সার ব্যাপারটা তখনকার সমাজে হয়ত ঠিকই ছিল, কিন্তু আজকে?

আজকের পৃথিবীতে বহু মেয়েই উপার্জনক্ষম, বহু মেয়ের উপার্জনেই সংসারে বাপ-ভাইয়ের মুখে অন্ন জুটছে, বহু স্ত্রীর উপার্জন স্বামীর চেয়ে বেশী, পিতৃহারা বহু সন্তানই মানুষ হচ্ছে শুধুমাত্র মায়ের উপার্জনেই। তা ছাড়া প্রহার করা তো সাংঘাতিক একটা মানসিক অপমানও বটে। যে অধিকার একটা ভালো লোককেও রাগের মুহূর্তে পশু বানিয়ে দিতে পারে, কোনো বেহেশতী ধর্ম তেমন একটা বিপদজনক অধিকার কাউকে কেন দেবে? বৌ বেচারাদের টাকা-পয়সা উপার্জনের সুযোগই দেয়া হয়নি, তাদের খাওয়া-পরার জন্য স্বামীর ওপরে চিরকাল নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে, সে জন্য? তাহলে যেসব স্বামী বৌয়ের উপার্জনে খায়, তারা কি বৌয়ের হাতে মার খাবে? এ অন্যায়টা কিন্তু কোনো কোনো মওলানার মাথায় ঠিকই ঢুকেছে। তাই কোরানের কোনো কোনো অনুবাদে আপনি দেখবেন 'প্রহার কর' কথাটার সাথে ব্র্যাকেটের ভেতর 'আস্তে করে' কথাটা ঢোকানো আছে। মানেটা কী? 'আস্তে করে প্রহার কর' – কথাটার মানেটাই বা কী? এ কি সেই ছোটবেলার পাঠশালার পণ্ডিত মশাইয়ের ধমক: অ্যাই! বেশী জোরে গণ্ডগোল করবি না! গণ্ডগোলের আবার আস্তে-জোরে কী?

আসলে ওটা হল অনুবাদকের কথা, কোরানের নয়। প্রায় সবগুলো অনুবাদেই আল্লার কথার সাথে সু প্রচুর ব্র্যাকেটের মধ্যে অনুবাদকের অবারিত লম্বা নাকটা ঢুকে আছে। এদিকে প্রত্যেকটি অনুবাদ বইতেই কিন্তু মস্ত একটা তফসির, অর্থাৎ ব্যাখ্যার অংশ আছে। তোমার যা বলার সেটা ব্যাখ্যার অংশে বল না কেন বাপু! অনুবাদের মধ্যে নিজের কথা ঢোকানোর অধিকার তোমাকে কে দিল? তা নয়, ভাবখানা এই যে, 'আস্তে করে', কথাটা যেন কোরানের-ই কথা। কিন্তু মানুষ কি গাধা? আস্তে করে 'ছোট্ট কলমই শাক দিয়ে কি প্রহার কর' বলে বিরাট কুমীরটা ঢাকা যায়? যায় না। এ প্রহার সকাল-বিকাল দিন-রাত চললেও কোনো অসুবিধে নেই, কারণ সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। আর বৌকে পিটিয়ে স্বামী যাতে মনে মনে অপরাধ বোধে না ভোগে, তার ব্যবস্থাও স্পষ্টভাবে দেয়া আছে হাদিসে।

সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২১৪২:
ওমর বিন খাত্তাব বলেছেন: নবী (দঃ) বলেছেন, "কোন স্বামীকে (পরকালে) প্রশ্ন করা হবে না কেন সে বৌকে পিটিয়েছিল"।

কি সাংঘাতিক ধর্মীয় সমর্থন, কল্পনা করা যায়? এ-ই হল সেই নির্লজ্জ সমর্থন, যা শুধু বইয়ের লেখাতে সীমাবদ্ধ থাকে না, কেয়ামতের মত যা নারীর মাথায় ভেঙে পড়ে। এরই শক্তিতে এই ২০০২ সালে দুবাই আদালত বিধান দিয়েছে, স্বামীরা বৌকে পেটাতে পারবে। এই সভ্য যুগে পৃথিবীর কোনো দেশের আদালত এই বিধান দিতে পারে, কল্পনা করা যায়? উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

দুবাই, ১লা এপ্রিল। দুবাইয়ের একটি আদালত রবিবার এক রায়ে স্বামীদের বৌ পেটানোর অধিকার দিয়েছে। দুবাই কোর্ট অফ ক্যাসেশনের রায়ে বলা হয়, 'স্ত্রীদের নিয়ন্ত্রণ' (নিয়ন্ত্রণে?) রাখতে স্বামীরা তাদের মারধর করতে পারবে। তবে মারধরের মাধ্যমে স্ত্রীদের শরীরে আঘাতের চিহ্ন বা ক্ষত সৃষ্টি করা যাবে না।" সূত্র: দুবাই থেকে

প্রকাশিত দৈনিক গাল্‌ফ নিউজের বরাতে টরন্টো থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশে বিদেশে, ৪ এপ্রিল, ২০০২ সাল। টরন্টোর 'নমস্তে ক্যানাডা' পত্রিকাতেও এ খবর ছাপা হয়েছে।

এখন বলুন, ইসলামে নারীর এ কেমন মর্যাদা? এর পরে আপনি বৌ পেটালে আপনাকে ঠেকিয়ে রাখার মত বাপের ব্যাটা দুনিয়ায় পয়দা হয় নি, হবেও না। সাধারণ মুসলমানেরা বৌ পেটায় না, সে শুধু মানুষের স্বাভাবিক মানবতা। কিন্তু তাহলে মেয়েদের বানানোই বা হল কেন? শস্যক্ষেত্রে শুধু চাষ করে ফলানো ছাড়াও এ ব্যাপারে হাদিস কেতাবে কী বলছে, তা পরীক্ষা করার আগে খোদ কোরান শরীফ কী বলছে তা দেখা যাক।
সুরা আল আরাফ আয়াত ১৮৯ (৭:১৮৯), এবং সুরা আর রূম আয়াত ২১ (৩০:২১):

যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র স্বত্বা থেকে। আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। "তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক।

হাওয়ার আগে যে আদম সৃষ্টি হয়েছে, তা সবাই জানে। ওপরের আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, কে কার জন্য সৃষ্টি হয়েছে এবং কী জন্য সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষের শরীরের সাথে ম্যাচ করেই যে নারীর শরীর বানানো হয়েছে, সেটাও কোনো কোনো পুরুষপন্থী ইসলামী চিন্তাবিদ বলতে ছাড়েন না। জব্বর বিশ্লেষণ বটে। এ বিশ্লেষণে নারী এ জীবনে শুধু বিছানার যৌবন আর বেহেশতে অতি অপূর্ব বাহাত্তর হুরীর শরীরের উত্তপ্ত প্রলোভন। সেখানে নারী মমতার সাগর মা নয়, স্নেহময়ী বোন নয়, প্রেমময়ী স্ত্রী নয়, জ্ঞানী শিক্ষয়িত্রী নয়, সক্ষম নেত্রী নয়, সে শুধু যৌবনের কামুক উন্মাদনা ছাড়া আর কোন কিছুই নয়।

সাধারণ মেয়েরা স্বামীর ইসলামী-পিট্টি খাবে, তা না হয় হল। কিন্তু অসাধারণ নারীরা?

এক নির্ভুল সত্য: শারিয়া হয়েছে পুরুষদের স্বার্থে।

ইসলামে শারিয়া বলে একটা কথা আছে, যা কিনা হল ইসলামী আইন। এ আইন মেয়েদের আর অমুসলমানের জন্য এতই বে-আইন যে, তা দু'-এক কথায় বলে শেষ করা যাবেনা। অমুসলমান খুন করলে মুসলমানের মৃত্যুদণ্ড হবেনা। সাত-সাতটা বিষয়ে মেয়েদের চোখের সামনে ঘটনা ঘটলেও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। যারা নিজের চোখে ধর্ষণ দেখেছে, এমন চার জন বয়স্ক মুসলমান পুরুষের সাক্ষ্য আদালতে পেশ না করতে পারলে ধর্ষিতার কপালে জুটবে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদণ্ড (বিবাহিতা হলে) অথবা আর অবিবাহিতা হলে চাবুকের আঘাত। এইসব হল শারিয়ার আইন-কানুন, এতই উদ্ভট যে, বিশ্বাস করাই মুশকিল। এ বইয়ের অন্য জায়গায় বিস্তারিত বলা আছে এ ব্যাপারে, প্রমাণসহ।

এমনিতে কলমা-নামাজ-রোজা-হজ্ব-জাকাত, ইসলামের এই হল পাঁচটা স্তম্ভ, নবীজির দিয়ে যাওয়া। এর পরেও শারিয়া কী করে যেন ইসলামের অঘোষিত ছয় নম্বর স্তম্ভ হয়ে ইসলামের অংশ হয়ে বসে আছে?

উত্তরাধিকারে মেয়েরা তো পুরুষের অর্ধেক বটেই, টাকা-পয়সার লেনদেনেও শারিয়াতে মেয়েদের সাক্ষী হল পুরুষের অর্ধেক। সাক্ষীতে কেন অর্ধেক? কারণ তারা ভুলে যেতে পারে। আর পুরুষ? না, পুরুষ হল যেন কম্পিউটার, কোনোদিন কোনই ভুল সে করতেই পারে না!

চলুন, দেখি এবার কোরান শরীফ, সুরা বাকারা, আয়াত ২৮২ (২:২৮২):

যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গত ভাবে তা লিখে দেবে;

..... দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর – যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ব্যস, হয়ে গেল। উত্তরাধিকারে বোন ভাইয়ের অর্ধেক পাবে, এটা তো আছেই, তার ওপরে দু'জন নারীকে সাক্ষী হবার ব্যাপারে এই যে এক পুরুষের সমান করা হল, এটা হাদিসে আইনে পরে বাড়তে বাড়তে একেবারে এমন স্বর্গে পৌঁছে গেল যে, এখন ইউনিভার্সিটি-কলেজের ছাত্রীবাসে পাঁচিল টপকে ঢুকে আপনি ডজন ডজন ছাত্রীর সামনেই অতি স্বচ্ছন্দে পছন্দসই কোন আসরার সর্বনাশ করে আসতে পারেন, এবং কোর্টকে কাঁচকলা দেখিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যেতে পারেন।

কারণ? কারণ, ইসলামী আইন অনুযায়ী চারজন মুসলমান পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া যাবে না। আর মেয়েদের সাক্ষী তো নৈব নৈব চ', তা তিনি ইন্দিরা-হাসিনা-খালেদা হলেও। কী সাংঘাতিক কথা! মেয়েদের কি সাংঘাতিক অপমান, তাই না? বিশ্বাস হচ্ছে না তো? জানি। দেখতে চান দলিল? এ বইয়েরই ইসলামী আইন অধ্যায়ে দেখানো আছে সব, দলিলের আতা-পাতাও দেয়া আছে। বটতলার মোল্লা-মুন্সীর নয়, একেবারে বাঘের ঘরের ইসলামী দলিল, পোকায় খেয়ে যাবে, তার বাপের সাধ্যি নেই। এরপরেও দরকার হলে ফ্যাক্স নম্বর পাঠাবেন, ফ্যাক্স করে পাঠিয়ে দেব। তার পরেও যদি কোনো কাঠমোল্লা তেড়ে আসে, শুধু জিজ্ঞাসা করবেন, পাকিস্তানের জাফরান বিবি, নাইজেরিয়ার আমিনা লাওয়াল কুরামীর কেইসটা কী, বলুন তো? এগুলো তো মধ্যযুগের নয়, এসব এই দু'হাজার এক সালের ইসলামী কোর্টের ঘটনা। দেখবেন, জোঁকের মুখে নুন আর হুঁকোর পানি দু'টোই একসাথে পড়েছে, কাঠমোল্লা বাবাজী প্রচণ্ড গোস্‌সায় দ্বিগুণ বেগে তসবী ঘোরাতে ঘোরাতে অনতিবিলম্বে সবেগে উল্টো পথে হাঁটা ধরেছেন।

একটু মস্করাই হয়তো করছি, কিন্তু বড় দুঃখেই করছি। হাজার হলেও ধর্মটা আমারই, এর মধ্যে এত অন্যায়ের, এত নিষ্ঠুরতার লজ্জা আমি রাখব কোথায়? নবী করিমের হাদিসেই দেখুন:

সহিহ্ বোখারি ভল্যুম ৭, হাদিস ৩০:

আবদুল্লা বিন ওমর বলেছেন, আল্লাহর নবী বলেছেন যে তিন জিনিসের মধ্যে অশুভ আছে, নারী, বাড়ী আর ঘোড়া।

সহিহ্ বোখারি ভল্যুম ৭, হাদিস ৩৩:

উসামা বিন যায়েদ বলেছেন, নবী বলেছেন যে আমার পর পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কিছু রইল না।

দেখলেন? আরও দেখাচ্ছি। এক সহিহ্ হাদিসই যথেষ্ট, তবু এ হাদিস আছে সহিহ্ মুসলিম বই ১, হাদিস ১৪২ নম্বরেও। বর্ণনা দিচ্ছি:

সহিহ্ বোখারি, ভলুম ১, হাদিস ৩০১:

আবু সাইদ আল খুদরী বলেছেন:- একদিন নবী (দঃ) ঈদের নামাজের জন্য মাসাল্লাতে গিয়েছিলেন। সেখানে কিছু নারীদের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন, "তোমরা সদকা দাও, কেননা আমি দোজখের আগুনে বেশীর ভাগ নারীদেরই পুড়তে দেখেছি।" তারা বলল:-"এর কারণ কি, ইয়া রসুলুল্লাহ?" তিনি বললেন:-"তোমরা অভিশাপ দাও এবং তোমাদের স্বামীদের প্রতি তোমরা অকৃতজ্ঞ। ধর্মে আর বুদ্ধিতে তোমাদের চেয়ে খাটো আমি আর কাউকে দেখিনি। একজন বুদ্ধিমান সংযমী পুরুষকে তোমাদের কেউ কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে।" তারা বলল:- "ইয়া রসুলুল্লাহ! ধর্মে আর বুদ্ধিতে আমরা খাটো কেন?" তিনি বললেন: "দু'জন নারীর সাক্ষ্য কি একজন পুরুষের সমান নয়?" তারা হ্যাঁ-বাচক জবাব দিল। তিনি বললেন: "এটাই হল বুদ্ধির ঘাটতি। এটা কি সত্যি

নয় যে মাসিক-এর সময় নারীরা নামাজ এবং রোজা করতে পারে না?" তারা হ্যাঁ-বাচক জবাব দিল। তিনি বললেন: "এটাই হল ধর্মে ঘাটতি।"

অবাক হচ্ছেন, পাঠক? এ তো সবে শুরু। নারী আর উটের মধ্যে তফাতটাই বা কী?

দেখা যাক এ ব্যাপারে সুনান আবু দাউদ কী বলছে।

সুনান আবু দাউদ ১১ খণ্ড, হাদিস ২১৫৫:

আবদুল্লা বিন আম'র বিন আ'স বলছেন: 'নবী (দঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ দাস-দাসী কিনলে বা বিয়ে করলে তাকে বলতে হবে- ও আল্লাহ! আমি এর স্বভাব চরিত্রে ভালো কিছুর জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আর এর চরিত্রের মন্দ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেউ উট কিনলেও তাকে উটের কুঁজো ধরে এ কথা বলতে হবে।"

মাতৃত্ব হল মানবজীবনের সর্বপ্রধান সম্পদ। এর চেয়ে বড় আশীর্বাদ মানুষ কল্পনাই করতে পারে না। এই মাতৃত্বের জন্যই স্বাভাবিকভাবে মাসিকের আয়োজন করেছে প্রকৃতি। অথচ এই একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারটাকে সমস্ত পুরুষতন্ত্র চিরটাকাল এত নিষ্ঠুরভাবে মেয়েদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে যে, ভাবলে অবাক হতে হয়।

হিন্দু (সনাতন) ধর্মে তো কথাই নেই, ইসলামেও মাসিককে 'রোগ' বা 'নোংরামি' হিসেবে দেখিয়ে মেয়েদের একেবারে অপবিত্র এবং খুঁতযুক্ত বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ওই সময়টায় তারা যে 'নোংরা', তা বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে। কোরানের সুরা বাকারা, আয়াত ২২২ (২:২২২) এবং সহিহ্ বোখারি ভল্যুম ৩, হাদিস নম্বর ১৭২-এ একথা স্পষ্ট লেখা আছে। তাই মুসলমান মেয়েদের ওই অবস্থায় ইসলাম নামাজ-রোজা করতে বা কোরান পড়তে দেয় না। মাতৃত্বের জন্য মেয়েদের কেন এ রকম কঠিন মূল্য দিতে হবে? মাসিকের অবস্থায় কী এমন তাদের মানসিক ঘাটতি হবে যে, তারা বিরাট জটিল ব্যবসা চালাতে পারবে, বিচারক হয়ে কয়েদীদের জেল দিতে পারবে, খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে

পারবে, কিন্তু উপাসনা-আরাধনা করতে পারবে না? মেয়েদের বিরুদ্ধে এটা একটা হীন চক্রান্ত ছাড়া আর কী?

এহেন নারীকে ইসলাম কি কোন দেশের রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধান মন্ত্রী হতে দেবে?

পাগল আর কী! তাই কি হয়?

সহিহ্ বোখারী ভল্যুম ৫,৭০৯:

সাহাবী আবু বাক্‌রা বলছেন, নবী (দঃ) বলেছেন যে, যে জাতি নারীর ওপরে নেতৃত্ব দেবে, সে জাতি কখনো সফলকাম হবে না।

মাঝে মাঝে মনে হয়, মেয়েরা কী এমন অন্যায়-অপরাধ করেছে যে জীবনের প্রতি পদে তাদের এত অপমান, অবজ্ঞা আর অত্যাচার সহ্য করতে হবে? পৃথিবীর যত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-মহাপুরুষ এমনকি নবী-রসুলকে পেটে ধরেনি তারা? মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে জন্ম দেয়নি তারা? পৃথিবীর যত খুন-জখম দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব তো পুরুষই করেছে এবং করে চলেছে। আশ্চর্য! যত শিক্ষিতাই হোক, যত আলোকিত উদারমনাই হোক, যত মেধাবী-বুদ্ধিমতীই হোক, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যত প্রাজ্ঞই হোক, মেয়ে হলেই তার আর রক্ষা নেই, সর্বগ্রাসী পুরুষতন্ত্র ইসলামের অন্ধকার কারাগারে তাকে আবদ্ধ করে রাখবেই। আর তার মাথাটা এমন মোহনভাবে ধোলাই করে দেবে যে, সে মেয়ে নিজেই সেই কারাগারে বসে বেহেশতের স্বপ্ন দেখবে, বেরোতেই চাইবে না সেখান থেকে যেখানে তাদের অপমান করতে করতে একেবারে শয়তান বলা হয়েছে।

অসহ্য! দেখুন:

সহিহ্ মুসলিম, বই ৮ হাদিস ৩২৪০:

জাবির বলেছেন: আল্লাহর নবী (দঃ) একদিন এক স্ত্রীলোক দেখে তাঁর স্ত্রী জয়নাবের কাছে এলেন, সে তখন একটা চামড়া পাকা করছিল। তিনি তার সাথে সহবাস করলেন। তারপর তিনি তাঁর সাহাবীদের কাছে গিয়ে বললেন, নারী শয়তানের রূপে আসে যায়। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নারীকে দেখলে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবে, তাতে তার মনের অনুভূতি দুর হবে।

আশ্চর্য লাগে এই ভেবে যে, ইসলাম পুরুষদের ভেবেছে কী? ইসলাম ধরেই নিয়েছে আমাদের পুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা নৈতিক বোধ বলতে কিছুই নেই, আমরা পুরুষেরা নারী দেখামাত্র একেবারে উন্মাদ বামা ক্ষ্যাপা হয়ে কাপড়-চোপড় খুলে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ব। নারীর সাথে সাথে আমাদের পুরুষদেরই বা এভাবে অপমান করার অধিকার ইসলামকে কে দিল?

ইমাম গাজ্জালীর মত বুলন্দ সুউচ্চ ধর্মনেতা ইসলামের ইতিহাসে বেশি নেই। তিনি যে শুধু ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তা-ই নয়, বহু বহু মওলানার মতে তাঁর স্থান স্বয়ং নবী (দঃ) এর পরেই। এহেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের লেখা এহিয়া উলুম আল দীন বইতে তাঁর যে উগ্র নারীবিদ্বেষী চেহারা আছে, তা সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দু'একটা দেখাচ্ছি।

এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ২ পৃষ্ঠা ৩৬৭:

শয়তান নারীকে বলে: তোমরা আমার সৈন্যদলের অর্ধেক। তোমরা আমার অব্যর্থ তীর। তোমরা আমার বিশ্বস্ত। আমি যা চাই তা তোমাদের মাধ্যমে হাসিল করি। আমার অর্ধেক সৈন্য হল কামনা, বাকি অর্ধেক হল ক্রোধ।

একই বই, ভলুম ২ পৃষ্ঠা ৩৭০-৩৭১ থেকে:

সাইদ ইবনে জুবায়ের বলেছেন, শুধুমাত্র দেখেই দাউদ (দঃ) এর মনে বাসনার উদ্রেক হয়েছিল। তাই তিনি তাঁর পুত্রকে (সুলায়মান দঃ) বললেন:- হে পুত্র! সিংহ বা কালো-

কোবরা সাপের পেছনে হাঁটাও ভাল, তবু কোন নারীর পেছনে হাঁটবে না। নবী (দঃ) বলেছেন:-"নারীর প্রতি কামনার চেয়ে পুরুষের জন্য বেশী ক্ষতিকর কিছু আমি রেখে যাচ্ছি না।"

একই বই, ভল্যুম ২,পৃষ্ঠা ৩৭৩:
স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর চারটি বিষয় কম থাকতে হবে নতুবা সে তাকে অবজ্ঞা করবে: বয়স,শারীরিক উচ্চতা, ধন সম্পদ, এবং বংশগৌরব। স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর চারটি বিষয় বেশী থাকতে হবে:- সৌন্দর্য, চরিত্র, আদব-কায়দা, এবং ধর্মে মতি।

কী লজ্জা, কী লজ্জা! মা-বোনদের সামনে আমাদের লজ্জার আর অবধি রইল না। ওহ! পাঠক! আমাদের মা-বোন-কন্যা-স্ত্রীরা যে আমাদের জন্য এত বড় অভিশাপ, আমরা তো তা জানতামই না! এখন তাদের নিয়ে কী করা যায়, বলুন তো? সব মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে জেলখানায় পুরে দেব? সে জন্যই বোধ হয় পর্দার নামে আপাদমস্তক ঢাকা বোরখার জেলখানা চালু হয়েছে। পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে এ উন্মাদনা নেই। তাই বুঝি মোল্লা নন্দ কবি বলেছেন:

মাথা থেকে পা ঢাকা কাপড়ের বস্তায়,
ঘুলঘুলি চোখে ভূত চলছে যে রাস্তায়।

জেনে রাখা ভাল নারীরা হচ্ছে পশু এবং ক্রীতদাসীর পর্যায়

যাক, মোল্লা নন্দ কবি ছেড়ে আবার ইসলামে নারীর প্রচণ্ড মর্যাদার দিকে তাকানো যাক।

সহিহ্ মুসলিম, বই ২৬, হাদিস ৫৫২৩:
আবদুল্লা বিন ওমর বর্ণনা করছেন: আল্লাহর নবী (দঃ) বলেছেন, দুর্ভাগ্য যদি কিছুতে থাকে, তবে তা হল বাড়ি, ঘোড়া আর নারী।"

সাব্বাশ!

ইসলামী বিশ্বকোষ (ডিকশনারি অব ইসলাম) থেকে পৃষ্ঠা ৬৭৮-৬৭৯:
সমগ্র মানব জাতির জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছুই আমি রেখে যাচ্ছি না। দুনিয়া এবং নারী থেকে দূরে থাকবে। কারণ নারীর কারণেই ইসরাইলের পুত্ররা প্রথম পাপ করেছিল।

সাব্বাশ!

সহিহ্ মুসলিম, বই ৩৬ হাদিস ৬৬০৩:
উসামা বিন যায়েদ বলেছেন: আল্লাহ'র নবী (দঃ) বলেছেন, আমার পরে পুরুষের জন্য নারীর কারণে ক্ষতির চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কিছুর সম্ভাবনা আমি রেখে যাচ্ছি না।

সাব্বাশ!

বটে! তারপর? আজকাল মেয়েরা মন দিয়ে পড়াশুনা করে অফিসগুলোতে বড় বড় বস হচ্ছে। তাহলে সে সব অফিসে আমরা কি চাকরী করব না? দেখুন ইমাম শাফির বক্তব্য, স্বয়ং পয়গম্বর কী বলেছেন।

শাফী শরিয়া (রিলায়েন্স অফ দি ট্রাভেলার বা উমদাত আল সালিক), পৃষ্ঠা ৬৭২, নম্বর পি-২৮-১:

নবী (দঃ) বলেছেন: পুরুষরা ধ্বংস হয়ে গেছে যখনি তারা মেয়েদের অনুগত হয়েছে।

মারহাবা, মারহাবা!

ইসলামে আরও একটা অতি চমৎকার খেল আছে, পারিবারিক ব্যাপারে। সেটা হল, স্ত্রী যদি কিছু উপার্জন করে, তাতে তার একচ্ছত্র অধিকার। সে উপার্জন সে নিজের পরিবারে খরচ করতেও পারে, না-ও পারে, স্বামীর অধিকার নেই তার ওপরে। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, স্ত্রীর খুবই একটা অধিকার এটা, তাই না? কিন্তু গোপন ব্যাপারটা হল, নিজের পরিবারে বাচ্চা কাচ্চার ওপর খরচ না করে সে স্ত্রী, সে মা সেই পয়সা খরচটা করবে কোথায়? অবশ্যই তার উপার্জন তার পরিবারেই খরচ হবে। তবে কিনা, এই ‘অধিকার’ দিয়ে তাকে কানে কানে বলে দেয়া হল, এ পরিবারে কিন্তু তোমার দায়িত্ব ঐ পর্যন্তই, স্বামীর সমান নয়। কাজেই তোমার অধিকারও ঐ পর্যন্তই, স্বামীর সমান নয়।

যেমন অন্য একটা হাদিসে আছে, হাট-বাজার করে এলে থলিটা পুত্রের হাতে না দিয়ে কন্যার হাতে তুলে দেবে, নবীর (দঃ) আদেশ। বড়ই মধুর আদেশ, একেবারে বেহেশ্তি আদর মেশানো। কিন্তু এতে করে কানে কানে সেই কন্যাকে বলে দেয়া হল, এবার আলু-পটলগুলো নিয়ে সটান রান্নাঘরে গিয়ে ঢোক।

সোনালী শৈশবের কথা মনে আছে, যখন আমরা আমাদের বাবা-মায়ের স্নেহে যত্নে আমরা ভাইবোনেরা বড় হচ্ছিলাম? পরিবারের শান্তি-সংহতি নির্ভরই করে পারস্পরিক সম্মানের ও বিশ্বাসের ওপর। কী হত, যদি আমাদের বাবা আর মা পরস্পরকে সম্মান না করতেন? বিশ্বাস না করতেন? ইসলাম বড়ই উঁচু গলায় চিৎকার করে, পারিবারিক মূল্যবোধের সে খুবই যত্ন নেয়। অবশ্যই, অবশ্যই, যত্নটা সে বড়ই নেয়। কিন্তু কীভাবে?

খুলে দেখা যাক খোদ সহিহ্ মুসলিম হাদিস থেকে, বই ৮ হাদিস ৩৪৭১:
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, নবী (দঃ) বলেছেন, বিবি হাওয়া না হলে স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের প্রতি কখনো অবিশ্বাসের কাজ করত না। অর্থাৎ স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের প্রতি অবিশ্বাসের কাজ করে থাকে।

চমৎকার সম্মানের কথা।

বিশ্বাস করুন নারীরা হচ্ছে ক্ষতিকর, শয়তান, এবং বক্র

এভাবেই ইসলাম চিরকালের জন্য মুসলমান মেয়েদের কপাল ফাটিয়ে দিয়েছে। শত পড়াশোনা করলেও, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হলেও, সহস্র আরাধনা করলেও, সারা জীবন চেষ্টা করলেও মেয়েদের উপায় নেই এ কঠিন লক্ষণরেখা পার হবার, পুরুষের সমান হবার। এবং তা শুধুমাত্র, শুধুমাত্র, এবং শুধুমাত্র মেয়ে হবার কারণেই। সাধারণত সাধারণ লোকেরা তাদের স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার করে না, সেটা তারা ভালো মানুষ বলেই। কিন্তু প্রতি পদে ইসলামের হুকুম মেনে চললে কুরুক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে দুনিয়া অচল হয়ে যেত, মেয়েদের আর্তনাদ-হাহাকারে সমাজ অচল হয়ে যেত।

ইসলামী বিশ্বকোষ থেকেই দেখা যাক এবারে। সংসার সুখের হবার জন্য স্বামীদের কানে ফিস ফিস করে কিছু তোগলকি উপদেশ দেয়া আছে সেখানে। সে অমূল্য উপদেশগুলো মেনে চললে সুখ তো দুরের কথা, বিভিন্ন রকম হুড় হাঙ্গামায় সংসার শিকেয় উঠতে বাধ্য।

এবারে শুনুন ইসলামী বিশ্বকোষ তার ৬৭৫ পৃষ্ঠায় স্বামীদের কি বলছে:

১. কষ্মিন কালেও স্ত্রীকে বেশী পিরীত দেখাবে না হে, তা হলেই সে কিন্তু লাই পেয়ে মাথায় উঠে সর্বদিকে বিশৃঙ্খল করে দেবে। চিত্ত যদি অতি প্রেমে গদগদ হয়ে ওঠেই, তবে অন্তত: স্ত্রীর কাছে সেটা চেপে রেখো বাপু!

২. বিষয়-সম্পত্তির পরিমাণ তো স্ত্রীকে বলবেই না, অন্যান্য গোপন কথাও লুকিয়ে রেখো সযত্নে। তা না হলেই কিন্তু সে তার দুর্বুদ্ধির কারণে সর্বনাশ করে দেবে সবকিছু।

৩. ও হ্যাঁ, তাকে কখনো কোন বাদ্য-বাজনা করতে দেবে না, আর যেতে দেবে না বাইরেও। পুরুষদের কথা বার্তা তো কিছুতেই শুনতে দেবে না।

হ্যাঁ, এই হল ইসলামে পতিদেবতা, একেবারে পাতি-দেবতা। আগেই দেখিয়েছি স্বামীকে কোরান অনুমতি দিয়েছে 'বেত্তমিজ' স্ত্রীকে প্রহার করার। কিন্তু এই শক্তিমান পতিদেবতা নিজেই যদি ব্রহ্মাস্ত্র হাতে হয়ে ওঠেন একেবারে 'পরশুরামের কঠোর কুঠার' বা ক্ষ্যাপা দুর্বাসা, তবে বেচারা স্ত্রী কী করবেন?

উপদেশ আছে সুরা নিসাতে, আয়াত ১২৮ (৪:১২৮):
যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পরের কোন মীমাংসা করে নিলে তাদের উভয়ের কোন গুনাহ নাই।

মীমাংসা উত্তম।

ঐ সুরার ৩৪ নম্বর আয়াতে স্বামীকে কিন্তু মীমাংসার চেয়ে বৌকে ধরে বেদম পিট্টি দেয়াটাকেই আরও উত্তম করে দেয়া আছে।

হাদিসে আছে আরও বিস্তারিত।
সহিহ্ বোখারি, ভল্যুম ৭, হাদিস ১৩৪:

সুরা নিসা আয়াত ১২৮ (৪:১২৮) পড়ে আয়েশা বর্ণনা করেছেন: এতে সেই স্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে যার স্বামী তাকে রাখতে চায় না, তাকে তালাক দিয়ে অন্য মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সে বলে – অন্য মেয়েকে বিয়ে করো, কিন্তু আমাকে তালাক দিয়ো না, আমার ওপরে খরচও করতে হবে না, আমার সাথে শুতেও হবে না।

এটাই নাকি হল সেই ‘পরস্পরের মীমাংসা উত্তম’।
চমৎকার মীমাংসা-ই বটে।

পনি কি জানেন না পুরুষদের জন্যে বহুগামিতা সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক?

ইসলামে চার বিয়ের কথা সবাই জানে। এটা একটা মারাত্মক নারী-বিরোধী প্রথা। *সুরা নিসা আয়াত নম্বর তিন (৪:৩) বলছে: আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের হক্ আদায় করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত।*

বিরাট ফাঁকি লুকিয়ে আছে এর ভেতর। মুসলমান পুরুষের জন্য ‘সর্বোচ্চ চার স্ত্রী’ কথাটা কিন্তু ঘোর মিথ্যে। গোপন সত্যটা হল, একসাথে এক সময়ে সর্বোচ্চ চার স্ত্রী। তারপরে যে কোনো স্ত্রীকে বা চারজনকেই এক মুহূর্তে একসাথে তালাক দিয়ে আবার চার মেয়েকে বিয়ে করতে কোনোই অসুবিধে নেই। নবীর (দঃ) নাতি ইমাম হাসান এটা করেছেনও। তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা ছিল আশী থেকে তিন’শ, বিভিন্ন বই অনুযায়ী। সাধারণ মুসলমানেরা এটা করেন না, সেটা অন্য কথা। কারণ সব ধর্মের সাধারণ মানুষেরাই ভাল মানুষ। আশ্চর্য কথা হলো: যখন এই আয়াত নাজিল হয়, তখন অনেক লোকের চারের বেশি স্ত্রী ছিল। আল্লার নির্দেশ এসে গেছে সর্বোচ্চ চার, এদিকে ঘরে আছে চারের বেশী। কি করা যায় এখন! নবী (দঃ) কে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন, পছন্দসই চার জন রেখে বাকী বউগুলোকে তালাক দিয়ে দিতে। ব্যস। ইসলামী বিয়ে-আইনের প্রথম বলি হল সেই নাম না জানা কাব্যে উপেক্ষিতাদের দল, যাদের কোনোই

অপরাধ ছিলনা। অথচ তারা এক নিমেষে ঘর হারাল, স্বামী হারাল, আশ্রয় হারাল, সন্তান হারাল।

দেড় হাজার বছর পার হয়ে গেছে, সেই নিরপরাধ হতভাগিনীদের নিঃশব্দ আর্তনাদের জবাব আজও পাওয়া যায়নি। আজও হয়তো সেই ধু ধু মরুভূমির বালুতে কান পাতলে অস্ফুটে শোনা যাবে তাদের চাপা দীর্ঘশ্বাস, ভালো করে খুঁজলে আজও হয়তো বালুতে দেখা যাবে শুকিয়ে যাওয়া ক'ফোটা অশ্রুবিন্দু। আর্ত হাহাকারে তারা শোনাতে চাইবে না বলা সেই করুণ কাহিনী। অথচ কি সহজেই না সমস্যাটার সমাধান হতে পারত!

কেন, সুরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াতেই (৪:২৩) দুই বোনের এক স্বামীর সাথে বিয়ে হওয়া বাতিল করা হয়নি? বলা হয়েছে যেন দুই আপন বোন একই লোককে বিয়ে না করে। এবং পরক্ষণেই বলা হয়েছে: 'কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে।" অর্থাৎ এ পর্যন্ত যাদের সে-রকম বিয়ে হয়েছে, তারা সতীন হয়ে থাকতে পারবে, কিন্তু এর পর থেকে আর ও রকম বিয়ে চলবে না।

না, চারের বেশী বউদের বেলায় তা বলা হয় নি, করা হয় নি। তালাক হয়ে গেছে তারা, কেউ জানে না, নীরবে নিঃশব্দে কতটা কেঁদেছে বিচারের বাণী। হায়রে মানবতার ধর্ম, সাম্যের ধর্ম!

এর পরেও আছে। পারিবারিক মূল্যবোধের ওপর প্রচণ্ড বক্তৃতার পরে স্বামীর অবাধ অফুরন্ত যৌবনের ব্যবস্থা আছে। শুধু একই কুয়োর বাঁধা পানিতে সারা জীবন নাইতে কি ভালো লাগে কারো? পুরুষের খাসলতটাই যে তা নয়। মেয়ে মানুষের শরীর যে তার চাই-ই চাই। সে জন্য সে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল মন্থন করবে, হাজারটা আইন বানাবে, হাজারটা আইন ভাঙবে, দরকার হলে ধর্মগ্রন্থের ওপরে পা রেখে দাঁড়াবে। আর তার অনেকটাই সে করবে আল্লার নামেই। হিন্দুধর্মেরও একই অবস্থা ছিল। ইসলামে আল্লার বিধানে মুসলমানদের উত্তপ্ত বিছানার জন্য আছে অফুরন্ত ক্রীতদাসীর ব্যবস্থা, এ বইয়ের

'ক্রীতদাস' অধ্যায়ে দেখুন। শুধু তা-ই নয়, সেই সাথে আরও আছে অগণিত যুদ্ধবন্দিনীর ব্যবস্থা। একের পর এক যুদ্ধ জয় করে পরাজিতদের শত-লক্ষ নারীদের নিয়ে তারা কী নৃশংস অপকর্ম করেছে, ভাবলে গা শিউরে ওঠে। সেই সব লক্ষ হতভাগিনীর মর্মান্তিক অভিশাপে চির-কলঙ্কিত হয়ে আছে ইসলামের ইতিহাস। অস্বীকার করতে পারবেন কোনো মওলানা?

এর পরেও আমাদের শুনতে হয় ইসলাম মানবতার ধর্ম। পরিহাস আর বলে কাকে!

কখনো ভেবেছেন, মওলানারা চিরকাল জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিরোধী কেন? একেই তো আমাদের গরীব দেশ, মানুষে মানুষে সয়লাব। আফ্রিকার মুসলমান দেশগুলোর অবস্থা তো আরও খারাপ। অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্য-বাসস্থান-চিকিৎসা, সবকিছুরই এত টানাটানি। সম্পদের তুলনায় মানুষের সংখ্যা এত বেশি যে, কিছুদিন পরে মানুষে মানুষ খাবে। কিন্তু তবু জন্মনিয়ন্ত্রণ শব্দটা শুনলেই মওলানাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। আল্লাই নাকি মানুষকে খাওয়াবেন। অথচ আমরা ইতিহাসে দেখেছি, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কোটি কোটি লোক স্রেফ না খেয়ে মরে গেছে। সোমালিয়া, ইথিওপিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমাদের বাংলার বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কথা মনে নেই? আর সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর? পর পর আট বছর বৃষ্টি হয়নি বাংলায়; বাংলা-বিহার উড়িষ্যার মোট তিন কোটি লোকের এক তৃতীয়াংশ, এক কোটি লোক মরে গিয়েছিল খেতে না পেয়ে।

অতি সম্প্রতি চারদিক দেখে শুনে যদিও তাঁরা এ ব্যাপারে তর্জন-গর্জন করাটা বাধ্য হয়েই বাদ দিয়েছেন, কিন্তু চিরটা কাল এটা ছিল তাঁদের একটা কৌশল। কিসের কৌশল? আমরা যারা পশ্চিম দেশগুলোতে থাকি, তারা এটা ভালই জানি। এসব দেশের সরকারগুলোর দয়াদাক্ষিণ্যে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে হাজার হাজার 'ছুটির দিনের ইসলামী স্কুল আর মাদ্রাসা' । সেগুলোতে বাচ্চাগুলোর মাথায় এই আসল মতলবটা একটু একটু করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। বিশ্বাস হচ্ছে না? পড়ে দেখুন যে কোন জায়গার খবরের কাগজগুলো, টরন্টো স্টার-এর ২রা ডিসেম্বর, ২০০১ এর সংখ্যা। এই

মতলবটা হল দুনিয়া জুড়ে শারিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা। তা করতে হলে দুনিয়া জুড়ে অন্য সবাইকে সমূলে উচ্ছেদ করে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া উপায় নেই।

কীভাবে সেটা সম্ভব?

হাতে প্রচুর অ্যাটম বোমা থাকলে কাজটা সহজ হত। কিন্তু সেটা যখন ‘শত্রুর’ হাতেই বেশি, তখন ভোটাভুটিই হল একমাত্র পথ। আর, ভোট মানেই হল জনসংখ্যা। মিলছে এবার হিসেবটা? আসলে এটাই হল জামাত-এ ইসলামী ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য। বুকে হাত দিয়ে বলুক কোনো মওলানা আমার কথাটা ভুল।

বিবাহের জন্যে বেছে নিন সর্বোৎকৃষ্ট মাল—ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী

জনসংখ্যার চাপে মানুষ মরে যাক না খেয়ে, তবু শারিয়া প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণ বে-ইসলামী, তাই জনসংখ্যা বাড়াতেই হবে। কথাটা কি আমার? মোটেই নয়, কথাটা সহিহ্ হাদিসের।

দেখুন।
সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২০৪৫:
মাকিল ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবীকে (দঃ) বলল “একটা উচ্চ বংশের সুন্দরী মেয়ে আছে, কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করতে পারি?” নবী (দঃ) বললেন,”না।” সে তাঁর কাছে আবার এল। নবী (দঃ) আবার তাকে নিষেধ করলেন। সে তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলে নবী (দঃ) বললেন:”সেই মেয়েদের বিয়ে কর যারা প্রেমময়ী এবং উৎপাদনশীল। কারণ আমি তোমাদের দিয়ে সংখ্যায় অন্যদের পরাস্ত করব।”

এটাই হল আসল ব্যাপার। সবাই মিলে-মিশে শান্তিতে থাকার কথাটা ইসলামের শুধু মুখ-মিষ্টি বুলি, আসলে যত দিক দিয়ে সম্ভব অন্যদের "পরাস্ত" করাটাই দুনিয়াভর বহু মওলানাদের মাথায় সর্বদাই নড়াচড়া করছে।

আরও দেখুন।

এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ১, পৃষ্ঠা ২২৮:

নবী (দঃ) বলেছেন, উর্বর এবং বাধ্য মেয়েদের বিয়ে কর। যদি সে অবিবাহিতা হয় এবং অন্যান্য অবস্থা জানা না থাকে, তবে তার স্বাস্থ্য এবং যৌবন খেয়াল করবে যাতে সে উর্বর হয়।

ইসলামে 'নারী' কথাটার মানে কী? উপরের হাদিসগুলো থেকে এটা পরিষ্কার যে, তারা হচ্ছে বাচ্চা বানানোর যন্ত্র বা মাল মাত্র। সম্মান, অধিকার, মর্যাদা সমস্ত কিছুই ওই একটা না-বলা কথায় বন্দী।

এটাই স্পষ্ট হয়েছে ইমাম গাজ্জালীর বইতে, এহিয়া উলুম আল দীন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৬- ২২৮-এ। দেখুন, কাকে বিয়ে করতে হবে সে ব্যাপারে কি রকম উদ্ভট পরামর্শ দেয়া আছে:

তাকে অসুন্দরী হলে চলবে না, হতে হবে সুন্দরী। তার স্বভাবটাও হতে হবে সুন্দর। এবং আরও:- নবী বলেছেন: সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তাকালে স্বামী তৃপ্ত হয়, স্বামীর যে বাধ্য, এবং স্বামীর অবর্তমানে যে নিজের এবং তার সম্পদ রক্ষা করে। যে সব মেয়েদের বিয়ে করা যাবে না তারা হল, বিবাহিতা, ধর্মত্যাগিনী, নাস্তিক, নারীবাদী, স্বাধীনচেতা, অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজক, অশ্লীল যৌনাচারে অভিযুক্ত তা সে প্রমাণিত হোক বা না-ই হোক, এবং এ ছাড়া কোরানে যাদের নিষেধ করা হয়েছে আত্মীয়তার কারণে।

আরও শুনবেন?

ওই একই পৃষ্ঠায়:

নবী বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হল সে-ই, যার চেহারা সুন্দর আর বিয়েতে স্ত্রীধন কম। অর্থাৎ যে কিনা দামে সস্তা।

আরও শুনুন:
নবী বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তাকালে স্বামী তৃপ্ত হয়, স্বামীর যে বাধ্য, এবং স্বামীর অবর্তমানে যে নিজের এবং তার সম্পদ রক্ষা করে।

বটেই তো, বটেই তো! সুন্দর মুখের তো জয় সর্বকালে সর্বত্র, এমনকি ইসলামেও। আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, মওলানা ইমামেরা কি একবারও ভেবে দেখেননি যে, সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এভাবে কথা বললে অসুন্দরীদের অপমান করা হয়? অসুন্দর কিংবা কম সুন্দর মেয়েদের বানালো কে? চেহারার সৌন্দর্য কি এতই গুরুত্বপূর্ণ?

অসুন্দরী হওয়া কি ইসলামে পাপ? এসব কথা ধর্মের বইতে কেন, সেটাও প্রশ্ন। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হল: দুনিয়ার সব পুরুষ কি উত্তমকুমার আর দেবানন্দ? তাহলে অসুন্দর পুরুষদের কী হবে?

সেটাও বলেছেন ইমাম গাজ্জালী, একই বইতে, পৃষ্ঠা ২৩৫:
আমি তাকে (এক মেয়েকে) জিজ্ঞাসা করলাম, এমন একটা লোককে (অসুন্দর লোককে) তুমি বিয়ে করলে কেন? সে বলল: 'চুপ কর, বাজে কথা বোল না! স্রস্টার কাছে সে হয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ, তাই তার জন্য আমি হয়ত স্রষ্টার পুরস্কার। আর আমি হয়ত স্রষ্টার কাছে, সর্বনিকৃষ্ট, তাই সে আমার জন্য স্রষ্টার শাস্তি।'

দেখুন, মেয়েদের কী রকম মাথা খাওয়া হয়েছে? এরই নাম ইসলামী ঈমান! এখনও অনেক মেয়ে আছেন, যাঁরা ইসলামে মেয়েদের অত্যাচারের সাংঘাতিক সমর্থক। ওটাই নাকি তাঁদের জন্য ভালো।

আশ্চর্য! আরও শুনবেন?

ঐ বই, ভলুম ১ পৃষ্ঠা ২২৯:

জাবের যখন এক পূর্ব-বিবাহিতাকে বিয়ে করল, তখন নবী (দঃ) বললেন: "কোন কুমারীকে বিয়ে করলে আরও ভালো হত কারণ তাহলে তোমরা পরস্পরের সাথে আরও উপভোগ করতে পারতে।"

ওটাই কথা, উপভোগই হল ইসলামে নারীর সর্বপ্রধান পরিচয়। বিদ্যাসাগর মশাই এত যে চেষ্টা-চরিত্র করে বিধবা-বিয়ের আইন চালু করলেন, বিধবা হতভাগিনীগুলো তাদের ছিনিয়ে নেয়া মানবাধিকার ফিরে পেল, এই ইসলামী কথা শুনলে তিনি কি ভির্মিই খাবেন না?

ইসলামী দেনমোহর (মোহরানা) কী জন্যে?

দেনমোহর ছাড়া আইনত: ইসলামী বিয়ে হতে পারে না। দেনমোহর হল কিছু টাকা বা সম্পত্তি যা বর কনেকে দেবে।

কোরানে আছে:

সুরা নিসা আয়াত নম্বর ৪ (৪:৪)-এ:

আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশী মনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ কর।

ভালো কথা! কিন্তু মোহরটা আসলেই কী? এটা কি দান? মোটেই নয়। উপহার? তৌবা তৌবা! না, এটা আসলে মূল্য শোধ ছাড়া আর কিচ্ছু নয়। কিসের মূল্য? নারীর শরীরের মূল্য। শুধু শরীরের মূল্য-ই নয়, একেবারে শরীরের গোপন অঙ্গের মূল্য। শুনতে খারাপ লাগছে? মা-বোন নিয়ে কথা, খারাপ লাগার-ই কথা। কথাটা আমি-আপনি বললে সবাই দূর-দূর করবে, পাত্তাই দেবে না। কিন্তু সেই একই কথা যদি ইসলামী আইনের বিশ্ববিখ্যাত লেখক মওলানা আবদুর রহমান ডোই তাঁর 'শারিয়া দি ইসলামিক ল' বইতে ১৬২ পৃষ্ঠায় স্পষ্টই বলেন, তবে? পাঠক দয়া করে বইটা খুলে দেখুন, মওলানা সাহেবের মতে মোহর অবশ্যই মূল্য শোধ ছাড়া আর কিছু নয়। কিসের মূল্য শোধ, মওলানা সাহেব? মুখ ফুটে বলেন না কেন কথাটা? কিঞ্চিৎ অসুবিধে লাগে? আচ্ছা, আপনি না বলুন, ওদিকে সহিহ্ বোখারি ঠিকই হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে সব গোমর ফাঁস করে দিয়েছে। কেতাবে লেখা আছে বলে বাধ্য হয়েই হোক আর যে কোন কারণেই হোক, কোনো

মওলানা বেকায়দা অস্বস্তিকর কথা বললেই তার কথাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করাটা আজকাল মুসলমানদের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই xxxx আর আবুল কাসেমের মত গঠনমূলক সমালোচকের দল তো বাদ-ই, ডোই সাহেব-ও বাদ দেয়া যাক। কিন্তু সহিহ্ বোখারি তো বাদ দেবার কোন উপায়ই নেই। ওগুলো তো ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ!

দেখুন।

সহিহ্ বোখারি ভলুম ৭ হাদিস ৮১:

উকবার বর্ণনামতে নবী (দঃ) বলেছেন: (বিয়ের) যে সব বিধানের মাধ্যমে তোমাদের অধিকার দেয়া হয়েছে (নারীদের) গোপন অঙ্গ উপভোগ করবার, সেগুলো মেনে চলতেই হবে।

ব্যস। গোপন অঙ্গও বলা হল, উপভোগও বলা হল, দাম দেবার কথাও বলা হল। আর তা কিন্তু বলা হল শুধু পুরুষকে-ই, নারীদের নয়। আর কী বাকী থাকল তাহলে বুঝতে? কাজেই, 'নারীর আর্থিক নিরাপত্তার' বক্তৃতা যত লম্বা গলাতেই যত চিৎকার করেই বলা হোক না কেন, মূল্যটা কেন যে শুধু পুরুষকেই শোধ করতে হচ্ছে এবং কোনো বস্তুর জন্য শোধ করতে হচ্ছে, তা এখন গাধাও বুঝবে।

ইসলামী বিশ্বকোষের (ডিকশনারি অব ইসলাম) ৯১ পৃষ্ঠাতেও কথাটা আছে।

দেখুন আরও একটি হাদিস:

সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২১২৬:

বাসরাহ্ নামে এক আনসারি বর্ণনা করলেন:

আমি পর্দায় আবৃত থাকা এক কুমারীকে বিবাহ করলাম। আমি যখন তার নিকটে আসলাম তখন তাকে দেখলাম গর্ভবতী। (আমি ব্যাপারটা নবীকে জানালাম।) নবী (সাঃ) বললেন: 'মেয়েটি মোহরানা পাবে। কেননা তুমি যখন তাকে মোহরানা দিলে তখন তার

যোনি তোমার জন্য আইনসিদ্ধ হয়ে গেল। শিশুটি তোমার ক্রীতদাস হবে এবং শিশুর জন্মের পর মেয়েটিকে প্রহার করবে (এই মত ছিল হাসানের)। 'ইবনে আবুস সারী বলেছেন: 'তোমার লোকেরা তাকে প্রহার করবে—খুব কঠোর ভাবে।'

এবং এই হাদিস।

সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২১২১:

মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে সওবান নবীর (দঃ) এক সাহাবি থেকে বর্ণনা করলেন: আলী নবীর (দঃ) কন্যা ফাতেমাকে বিবাহ করে তাঁর সাথে সহবাস করতে চাইলেন। আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) আলীকে নিষেধ করলেন তাঁর কন্যার সাথে সহবাস করতে যতক্ষণ না আলী ফাতেমাকে কিছু দিয়ে দেন। আলী বললেন: 'আমার কাছে কিছুই নেই।' আল্লাহ্‌র রসুল (দঃ) বললেন: 'তোমার যুদ্ধের পোশাক তাকে দিয়ে দাও। 'আলী তাই করলেন এবং ফাতেমার সাথে সহবাস করলেন।

যাহোক, এখন দেখা যাক নারীর 'গোপন অঙ্গ'-কে 'উপভোগ'-এর যে মালিকানা, তার মূল্য কত হতে পারে। নারীর জন্য তা যতই অমূল্য সম্পদ হোক, শরীরটা হোক তার নিজেরই, কিন্তু তার দাম ধরবার বেলায় নারীকে কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে? পাগল! 'বিক্রেতা' নারী, দাম ধরবার মালিক কিন্তু ক্রেতা, অর্থাৎ পুরুষ! ক্রেতা ইচ্ছে করলেই সে বাজারে প্রচুর 'মূল্যহ্রাস'ও করে ফেলতে পারে। করে ফেলেছেও। কী চমৎকার উদ্ভট বাজার, তাই না? মূল্যহ্রাসের উদাহরণ চান? নারী রাজি হলে ব্যাপারটা একেবারে মুফত, ফ্রি, পয়সা-কড়ি না হলেও চলবে। লক্ষ লক্ষ গরীব হতভাগ্য বাপ-মায়ের হতভাগিনী মেয়েরা রাজি না হয়ে যাবে কোথায়? অদৃশ্য অর্থনৈতিক দড়ির শৃঙ্খল পরানো আছে না তাদের গলায়? বাপ বাপ বলে রাজি হবে তারা।

আবার খুলে দেখুন মওলানা ডোই-এর ইসলামী আইনের বই, পৃষ্ঠা ১৬৩ আর ১৬৪, কোরান থেকে পুরুষ দু'-চারটা আরবি উচ্চারণ করলেই মূল্য শোধ হয়ে গেল। কিংবা একজোড়া জুতো হলেও চলবে। নতুন না পুরনো জুতো তা অবশ্য বলা হয়নি। আমরা

ভালো করেই জানি, আমাদের স্ত্রীরা কত অমূল্য, কত স্বর্গীয়। তাদের মূল্য শুধুমাত্র একান্ত আবেগ দিয়ে, পরম ভালোবাসা দিয়ে এবং চরম সহানুভূতি দিয়েই শোধ দিতে হবে। তাকে এত অবমাননা করবার, এত সস্তা করার অধিকার ইসলামকে কে দিল?

পাঠক! এখানেই শেষ নয়, এ তো সবে শুরু। এর পরে আছে স্ত্রীকে শত-সহস্র হাতে জড়িয়ে ধরা। আবেগে নয়, ভালোবাসায় নয়, মানবতায় তো নয়ই। জড়িয়ে ধরা শৃঙ্খলে-শৃঙ্খলে, আদেশে-নির্দেশে, অজস্র তর্জনী-সংকেতে, ইহকাল পরকালের শাস্তিতে-শাস্তিতে। ক্ষমাহীন স্পর্ধায় দলিত-মথিত করা তার চলন-বলন, আচার-বিচার, মন-মানস, ব্যবহার-ব্যক্তিত্ব, ধ্যান-ধারণা, জীবন-মরণ।

দেখুন:

১. সহিহ্ মুসলিম, বই ৮ হাদিস ৩৩৬৬:
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, নবী (দঃ) বলেছেন, যে স্ত্রী স্বামীর বিছানা থেকে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, ফেরেশতারা তাকে সকাল পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।

২. সহিহ্ মুসলিম, বই ৮, হাদিস ৩৩৬৭:
আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, নবী (দঃ) বলেছেন: যাঁর হাতে আমার জীবন (আল্লাহ্) তাঁর নামে বলছি, যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে, আর সে স্ত্রী সাড়া না দেয়, তবে সে স্বামী খুশী না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

৩. ইমাম গাজ্জালী, বই এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ১ পৃষ্ঠা ২৩৫:
নিজের সমস্ত আত্মীয়, এমন কি নিজের থেকেও স্বামীকে বেশী প্রাধান্য দিতে হবে। যখনই স্বামীর ইচ্ছে হবে তখনই সে যাতে স্ত্রীকে উপভোগ করতে পারে সে জন্য স্ত্রী নিজেকে সর্বদা পরিষ্কার এবং তৈরি রাখবে।

৪. ইমাম শাফি শারিয়া আইন (উমদাত আল সালিক) থেকে, পৃষ্ঠা ৫২৫ আইন নম্বর এম-৫-১:
স্বামীর যৌন-আহ্বানে স্ত্রীকে অনতিবিলম্বে সাড়া দিতে হবে যখনই সে ডাকবে, যদি শারীরিকভাবে সে স্ত্রী সক্ষম হয়। স্বামীর আহ্বানকে স্ত্রী তিনদিনের বেশি দেরি করাতে পারবে না।

৫. শারিয়া আইন থেকে (উমদাত আল সালিক), পৃষ্ঠা ৫২৬ আইন নম্বর এম-৫-৬:
যৌন মিলনের জন্য শরীর পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে স্ত্রীকে চাপ দেবার অধিকার স্বামীর আছে।

৬. শারিয়া আইন থেকে, পৃষ্ঠা ৯৪ আইন নম্বর ই-১৩-৫:
স্ত্রী যদি বলে তার মাসিক হয়েছে আর স্বামী যদি তা বিশ্বাস না করে, তাহলে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা স্বামীর জন্য আইনত: সিদ্ধ।
(মানেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু ওই কথাগুলোই লেখা আছে বইতে।)

৭. শারিয়া আইন থেকে, পৃষ্ঠা ৫৩৮ আইন নম্বর এম-১০-৪:
নবী (দঃ) বলেছেন, আল্লাহ এবং কেয়ামতে যে স্ত্রী বিশ্বাস করে, সে স্বামীর অনিচ্ছায় কাউকে বাসায় ঢুকতে দিতে বা বাসার বাইরে যেতে পারবে না।

কেন? বাসার বাইরে যেতে পারবে না কেন? স্ত্রী কি গরু-ছাগল, নাকি গাধা? যে স্ত্রী সারা জীবনের সাথী, তাকে বিশ্বাসও করা যাবে না, স্বামীর উত্তেজনার সময়? খুলে খুলে দেখতে হবে তার শরীর? উহ!! সহবাস, সহবাস আর সহবাস! মিলন, মিলন আর মিলন! শরীর, শরীর আর শরীর! যৌবন, যৌবন আর যৌবন! বেহেশতে হুরী, হুরী, আর হুরীর শরীরের বর্ণনা আর যৌনপ্রলোভন! আইন, আইন আর আইন! চাপ, চাপ আর চাপ! বাঁধন, বাঁধন আর বাঁধন! আইনের-বিধানের এই দম বন্ধ করা বজ্র-আঁটুনিই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামের সখাত-সলিল, হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড একটা ফস্কা গেরো।

আজ যে পৃথিবীর বেশির ভাগ মুসলমান হয়ে গেছেন ‘নন-প্র্যাকটিসিং’, অর্থাৎ নামাজ-রোজা-হজ্ব-জাকাত না করা মুসলমান, তার প্রধান কারণটাই এটা। পৃথিবীতে আর কোনো ধর্ম উঠতে-বসতে প্রতিটি দিন মানুষের এত বেশি সময় নেয় না, দশদিক দিয়ে অক্টোপাসের মত এত চেপে ধরে না। ধর্মের নামে অত্যাচার অনাচার ছাড়াও উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, খেতে-পরতে, ব্যবহারে-ব্যক্তিতে, ধ্যানে-ধারণায়, হাঁচি-কাশিতে, ঘরের বাইরে এমনকি বাথরুমে পর্যন্ত যেতে-আসতে ইসলামের কিছু না কিছু বিধান আছেই। তা হলে আর মগজ দিয়ে করবটা কী? মানুষ কি প্রোগ্রাম করা রবোট নাকি? এ কথাই বলেছিলেন কাজী ওদুদ আর আবুল হুসেন, সেই উনিশ’শো তিরিশ-চল্লিশ সালেই, ‘আদেশের নিগ্রহ’ ইত্যাদি লিখে। এবং এর ফলে মহা ঝামেলায় পড়েছিলেন মওলানাদের হাতে।

“এভাবে চললে বাংলার মুসলমানের সর্বনাশ হয়ে যাবে, ধর্ম বলছে: ‘চোখ বুঁজে মেনে চল, দর্শন বলছে চোখ খুলে চেয়ে দেখ’,- বলে গেছেন আবুল হুসেন সেই আশী বছর আগেই। কেউ কথা শোনেনি, সর্বনাশটা ঘটেই যাচ্ছে প্রায়।

তাহলে আমরা দেখলাম, মুখে ইসলাম যা-ই বলুক, আসলে যৌবনের কামুক উন্মাদনা এবং বাচ্চা বানানোর যন্ত্র হল স্ত্রীর অন্য সবচেয়ে বড় পরিচয়। ইসলাম তো ধরেই নিয়েছে যে, স্ত্রীরা ‘তোমাদের পয়সা খরচ করে’ এবং চিরকাল করেই চলবে। তারা কোনোদিনই নিজেরা উপার্জন করবে না। কাজেই স্বামীর কর্তব্য হল স্ত্রীর খরচ চালানো।

ভালো! তা, সে খরচটা কত? সেটাও আমার-আপনার বুদ্ধি-বিবেকের ওপর, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্কের ওপর ছেড়ে দিতে ভরসা পায়নি ইসলাম, খরচের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছে।

ভেবেই পাই না, ইসলাম আর কতকাল মানুষকে বাচ্চা ছেলের মত আঙুল ধরে ধরে হাঁটানোর স্পর্ধা দেখাবে। পাহাড়ের গুহা থেকে উঠে এসে মানুষ এখন চাঁদের পাথর

কুড়িয়ে আনছে, তার কি কোন সম্মান নেই? এই যে মানুষকে যুগ যুগ ধরে এত প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, রাতদিন নাওয়া-খাওয়া-ঘুম হারাম করে এত গবেষণা করে নানা রকম রোগের ওষুধ বানাতে হল, তখন ইসলাম কোথায় ছিল? হাসপাতালের অসংখ্য রকম মেশিনের অকল্পনীয় সূক্ষ্ম কর্মকাণ্ড দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। একটা জাহাজ বা এরোপ্লেনেই বা কত শত কারিগিরী! সুপারসনিক প্লেন, আকাশছোঁয়া বিল্ডিং বা টাওয়ার বা সেতু দেখলে, মহাশূন্যগামী রকেট বা সাগরতলের গবেষণার কথা ভাবলে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় মানুষ হিসেবে বুক গর্বে ফুলে ওঠে। সেই মানুষকে বলে দিতে হবে, কার কত খরচ? আইন বানিয়ে লিখে দিতে হবে, চুরি ডাকাতির শাস্তি কী? আশ্চর্য!

এই ব্যাপারে আমরা আরও পড়ব আসছে অনুচ্ছেদে।

এবার আসি খোরপোষের কথায়। খোরপোষ হল স্বামী তার স্ত্রীকে যে ভরণপোষণ দেবে সেটা। এ ভারটা স্বামীকে বইতেই হবে। ভালো! কিন্তু ভালোটা ঐ পর্যন্তই। আসলে এ ব্যাপারে ইসলামের শারিয়া মেনে চললে মানবতা জবাই হতে বাধ্য। বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে। হতেই হবে। এর ভেতরে যে কী সাংঘাতিক চালাকি আর নিষ্ঠুরতা আছে, তা-ই আমরা দেখব এবার।

সেই খরচে যাবার আগে একটু কোরান ঘেঁটে দেখা যাক, স্বামী তার স্ত্রীকে কী কী দিতে বাধ্য থাকবে।

বাংলা কোরান, পৃষ্ঠা ৮৬৭, তফসির:
কুরতুবী বলেন: এ আমাদের আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব (বাধ্য), তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ: আহার,পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়।

বোঝা গেল ব্যাপারটা? শিক্ষা নয়, চিকিৎসা নয়, শুধু আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। তা-ও ভালোবেসে দেয়া-নেয়া নয়, শুধু বাধ্য হয়ে দেয়া, অথবা অনুগ্রহ করে দেয়া। এই কি স্বামী-স্ত্রীর অনুপম ভালোবাসার বেহেশতী সম্পর্ক হল, না মস্ত একটা ঘোড়ার ডিম হল, বলুন আপনারা?

যাক, দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর লাভ নেই। এবারে স্ত্রীর ওপরে খরচ দেখা যাক, সে খরচটা কতো? বলে গেছেন ইমাম শাফি ই তাঁর বিশাল শারিয়া আইন (উমদাত আল সালিক) বইতে। আসুন এই সব আমরা এখন তন্ন তন্ন করে দেখি।

স্ত্রীর ভরণপোষণ

এই ব্যাপারে শারিয়া আইন একেবারে জলবৎতরলং। দেখুন:

শারিয়া আইন এম ১১.২ (ঐ বই পৃঃ ৫৪২)
স্বামীকে স্ত্রীর দৈনিক ভরণপোষণের ব্যয় বহন করতে হবে। স্বামী সচ্ছল হলে স্ত্রীকে প্রতিদিন এক লিটার শস্য দিতে হবে যা কিনা ঐ অঞ্চলের প্রধান খাদ্য। (O. এখানে প্রধান খাদ্য বলতে বুঝান হচ্ছে যা ঐ অঞ্চলের লোকেরা সর্বদা খায়, এমনকি তা যদি শক্ত, সাদা পনিরও হয়। স্ত্রী যদি তা গ্রহণ না করে অন্য কিছু খেতে চায়, তবে স্বামী তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে না। স্বামী যদি প্রধান খাদ্য ছাড়াও স্ত্রীকে অন্য কিছু খেতে দেয় তা স্ত্রী গ্রহণ না করলেও করতে পারে।) অসচ্ছল স্বামী প্রতিদিন তার স্ত্রীকে ০.৫১ লিটার খাদ্যশস্য দিবে। আর যদি স্বামীর সামর্থ্য এর মাঝামাঝি হয় তবে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রতিদিন ০.৭৭ লিটার খাদ্যশস্য দিতে বাধ্য থাকবে।

এছাড়াও স্বামীকে শস্য পেষণের খরচ দিতে হবে যাতে ঐ শস্য আটা করে রুটি বানানো হয়। (O. স্ত্রী একাজ নিজে করলেও স্বামীকে খরচটা দিতে হবে স্ত্রীকে।) রুটি খাওয়ার জন্য অন্য যে সব সামগ্রী দরকার, যেমন, মাংস, তেল, লবণ, খেজুর, সির্কা, পনীর ইত্যাদি তা ও সরবরাহ করতে হবে। এসবের পরিমাণ নির্ভর করবে মরশুমের উপর। ফলের মরশুমে যে ফল পাওয়া যাবে তাই হবে প্রধান। ঐ শহরের লোকেরা যে পরিমাণ মাংস খায় স্ত্রীকেও সেই পরিমাণ মাংস দিতে হবে।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে রাজী থাকলে স্ত্রীর দৈনিক খোরপোষের খরচ স্বামী টাকায় অথবা কাপড়ে দিতে পারবে।

এখন ক্যালকুলেটর নিয়ে হিসাব করুন: প্রতিদিন আপনার স্ত্রীকে কয় মুঠো চাল (বাংলাদেশে), কয় মুঠো ডাল, কী পরিমান লবণ, তেল, শাকসব্জি, মাংস, মাছ ইত্যাদি আপনি দিচ্ছেন! এর পরে এর টাকার পরিমাণটাও হিসেব করে নিন। এইই হবে আপনার স্ত্রীর দৈনিক ভাতা। এর বেশী আপনার স্ত্রী আপনার কাছে চাইতে পারবে না। ঐ দৈনিক খাদ্য দিয়েই আপনার স্ত্রীকে বেঁচে থাকতে হবে। এটাই হলো ইসলামী নিয়ম। আপনি দয়াপরবেশ হয়ে স্ত্রীকে বেশী দৈনিক ভাতা দিলে তা আপনার মর্জি।

*শারিয়া আইন **১১.৩** (ঐ বই, পৃঃ ৫৪৩) স্ত্রীর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের জন্য দরকারী বস্তুসমূহ: স্ত্রী তার কেশবিন্যাসের জন্য তেল, শ্যাম্পু, সাবান, চিরুনি পাবে। (যা সেই সহরে সচরাচর ব্যবহার হয়।) স্বামীকে তার স্ত্রীর বগলের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য যে সুগন্ধির প্রয়োজন তা দিতে হবে। যৌন সংগমের পূর্বে ও পরে স্ত্রীর গোসলের যে পানি দরকার তা স্বামীকে দিতে হবে। সন্তান প্রসবের পরে রক্ত ধৌত করার জন্য যে পানির প্রয়োজন তাও স্বামীকে দিতে হবে। এই দুটি কারণ ছাড়া স্বামী তার স্ত্রীকে সাধারণ গোসল অথবা ধৌতের জন্যে যে পানির প্রয়োজন তার খরচ দিতে বাধ্য থাকবে না।*

শারিয়া আইন এম **১১.৫** (ঐ বই পৃঃ ৫৪৪) কাপড় চোপড়ের খরচ:
স্ত্রী যে অঞ্চলে থাকবে ঐ অঞ্চলের যা প্রধান পোশাক স্ত্রী তা পাবে। (O. পোশাক নির্ভর করবে স্ত্রী লম্বা না বেঁটে, খর্ব না স্থূল এবং মরশুম গ্রীষ্ম না শীত কাল।) গ্রীষ্ম কালে স্বামী বাধ্য থাকবে স্ত্রীকে মাথা ঢাকার কাপড় দিতে। এছাড়া গায়ের লম্বা জামা, অন্তর্বাস, জুতা ও একটা গায়ের চাদর দিতে হবে, কেননা স্ত্রীকে হয়ত বাইরে যেতে হতে পারে। শীতের মরশুমে ঐ একই পোশাক দিতে হবে এবং অতিরিক্ত হিসাবে একটা লেপের মত সুতি বস্ত্রও দিতে হবে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য। শীতের সময় প্রয়োজন পড়লে গরম করার তেল অথবা লাকড়ি যা দরকার তাও দিতে হবে। এ ছাড়াও সামর্থ্য

অনুযায়ী স্বামীকে দিতে হবে, কম্বল, বিছানার চাদর, বালিশ ইত্যাদি। (O. খাওয়াদাওয়া ও পান করার জন্য যেসব সামগ্রী দরকার তাও স্ত্রীকে দেওয়া দরকার।)

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এই সব কাপড়-পোশাক স্ত্রী পাবে এক মরশুমের জন্য। অর্থাৎ এক মরশুমে যদি কাপড়-পোশাক ছিঁড়ে যায় বা অকেজো হয়ে যায়, তবে স্বামী আবার তা সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে না। তাই শীতের পোশাক যদি শীত শেষ হবার আগেই লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, তবে স্বামী আবার শীতের পোশাক সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে না। এই আইনটিই বলা হয়েছে এম ১১.৭ (ঐ বই পৃঃ ৫৪৪) এ।

অনেকে ভাববেন এ তো মন্দ নয়। ইসলাম স্ত্রীকে কিছু না কিছু অধিকার দিয়েছে তার স্বামীর কাছ থেকে পাওনার জন্য। কিন্তু এর মাঝে যথেষ্ট হেরফের আছে। দেখুন এই আইনটি।

শারিয়া আইন এম ১১.৯ (ঐ বই পৃঃ ৫৪৫): স্বামীর ভরণপোষণ শর্তযুক্ত:
স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামী সে পর্যন্তই বহন করবে যে পর্যন্ত চাহিবার মাত্র স্ত্রী তার স্বামীকে দেহদান করে অথবা দেহদানের প্রস্তুতি দেখায়। এর অর্থ হচ্ছে স্ত্রী স্বামীকে পূর্ণ যৌন উপভোগ করতে দিবে এবং কোন অবস্থাতেই স্বামীর যৌন চাহিদার প্রত্যাখ্যান করবে না। স্বামীর ভরণপোষণ স্ত্রী পাবেনা যখন:

- *স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হবে, তার মানে যখন স্ত্রী স্বামীর আদেশ অমান্য করবে এক মুহূর্তের জন্যে হলেও।*
- *স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ভ্রমণে যায় অথবা স্বামীর অনুমতি নেয়, কিন্তু ভ্রমণ করে নিজের প্রয়োজনে।*
- *স্ত্রী হজ্জ অথবা ওমরা করার উদ্দেশ্যে এহরাম করে।*
- *স্ত্রী যদি স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে নফল রোজা রাখে।*

এখানে একটা প্রশ্ন এসে যায়: কোনো সময় যদি স্ত্রী অসুখে পড়ে যায়, তবে তার কী হবে? কেই বা তার অসুখবিসুখের খরচা চালাবে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটা সত্যি যে, শারিয়া আইন বলছে স্ত্রীর অসুখবিসুখ, ঔষধপত্র অথবা চিকিৎসকের খরচ স্বামী বহন করতে বাধ্য নয়। যদি স্ত্রীর মেডিকেল খরচ স্বামী বহন করে, তবে সেটা স্বামীর মানবিকতা - ইসলামী পুণ্য নয়।

এবার দেখা যাক আরও কতকগুলো ইসলামী আইন যা আমাদের মহিলাদেরকে বানিয়ে রেখেছে ক্রীতদাসী হিসাবে।

আইন এম ১১.৪ (ঐ বই পৃঃ ৫৪৪)
স্বামী তার স্ত্রীর প্রসাধন সামগ্রী, চিকিৎসকের খরচ, ঔষধের খরচ অথবা এই ধরনের অন্যান্য খরচ বহন করতে বাধ্য থাকবে না, যদিও স্বামী চাইলে তা করতে পারে। এটা শুধু সুপারিশ, বাধ্যবাধকতা নয়। কিন্তু শিশু জন্মের সাথে জড়িত খরচ স্বামীকে বহন করতে হবে।

আরও একটি অমানুষিক ব্যাপার হচ্ছে যে, স্ত্রী তার ভরণপোষণ পাবে দৈনিক ভাবে - মানে দিন কে দিন। তার অর্থ হল, স্ত্রীর খাওয়া দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থার নিরাপত্তা মাত্র এক দিনের জন্য। স্বামী চাইলে যে কোনো সময় তুচ্ছ অজুহাত তুলে স্ত্রীর ভরণপোষণ বন্ধ করে দিতে পারে।

আইন এম ১১.৬ (ঐ বই পৃঃ ৫৪৪)
দৈনিক ভাতা শুরু হবে দিনের শুরুতে। স্বামী তার স্ত্রীকে দিনের প্রথমে স্ত্রীর দৈনিক ভাতা দিতে বাধ্য থাকবে। মরশুমের শুরুতেই স্বামী তার স্ত্রীকে পোশাকের কাপড় দিয়ে দিবে।

তালাক প্রাপ্ত ও গর্ভবতী স্ত্রীদের কী অবস্থা?

আইন এম ১১.১০ (ঐ বই পৃঃ ৫৪৬)

যে স্ত্রী ইদ্দতে থাকবে, সে তালাক (অস্থায়ী) অথবা বিধবার জন্যই হোক, তার অধিকার থাকবে স্বামীর গৃহে থাকার ইদ্দতের সময় পর্যন্ত। এরপর ভরণপোষণের ব্যাপারটা এই রকম:

- *১. তিন তালাক (স্থায়ী তালাক) হয়ে গেলে স্ত্রী ইদ্দতের সময় ভরণপোষণ অথবা ইদ্দতের পর কোন প্রকার ভরণপোষণ পাবে না। বিধবা নারীও কোন দৈনিক ভাতা পাবে না।*
- *২. ভরণপোষণ হবে একমাত্র ইদ্দতের সময়, তাও যদি তালাক অস্থায়ী হয় যথা এক তালাক অথবা দুই তালাক, যেখানে সম্ভাবনা আছে যে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফেরত চাইবে।*
- *৩. তিন তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী যদি গর্ভবতী থাকে সে দৈনিক ভাতা পাবে (A. শিশু ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত। এর পর শিশুর দেখা শোনা ও লালনপালনের জন্যে।) । স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা না থাকলে সে কোন ভাতাই পাবে না।*

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার

আসুন, এবার আমরা দেখি, স্বামী কী চায় স্ত্রীর কাছ থেকে। শারিয়া আইন অনুযায়ী, যে মুহূর্তে স্বামী স্ত্রীকে মোহরানার টাকা দিয়ে দেবে অথবা পরে দেবার অঙ্গীকার করবে, সেই মুহূর্তে স্বামী নারীটির দেহবল্লরী কিনে নিলো - অথবা নারীটির আপাদমস্তক দেহের পূর্ণ মালিকানা পেয়ে গেল। অবশ্যই এ বলতে নারীটির যৌনাঙ্গ বলা হচ্ছে। শারিয়ার নিয়ম অনুযায়ী নারীটির শরীরের অস্থি, মজ্জা, মাংস, পেশী, রক্ত, চুল, চামড়া...ইত্যাদি সহ সন্তানধারণের যন্ত্রটি স্বামীর এখতিয়ারে চলে আসবে। নারীর অন্যতম কর্তব্য হবে তার যৌনাঙ্গ ও গর্ভকে সর্বদা ক্রিয়াশীল করে রাখা - যেমন ভাবে এক কারিগর তার কাজের যন্ত্রপাতি তেল, ঘষামাজা দিয়ে প্রস্তুত রাখে। এসবের জন্যে মুসলমানদের দরকার স্ত্রীকে ব্যাবহারের নিয়মাবলী। দেখ যাক, এই সব নিয়মাবলী কী রকম।

শারিয়া আইন (উমদাত আল-সালিক) নম্বর এম ৫.৪ (পৃঃ ৫২৬):
স্ত্রীর দেহকে উপভোগ করার পূর্ণ অধিকার থাকবে স্বামীর। (A: আপাদমস্তক পর্যন্ত, তথা পায়ের পাতা পর্যন্ত। কিন্তু পায়ু পথে সঙ্গম করা যাবে না—এটা বে-আইনি) । তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যৌনসংগম কালে স্ত্রী যেন ব্যথা না পায়। স্বামী তার স্ত্রীকে যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্ত্রীর পায়ুপথে সঙ্গম করা বে-আইনি শুধুমাত্র সুন্নীদের জন্যে। শিয়াদের জন্য আইন অন্য রকম। একজন শিয়া স্বামী তার স্ত্রীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করতে পারবে। এই ব্যাপারে সুনান আবু দাউদের ইংরাজি অনুবাদক অধ্যাপক আহমদ হাসানের মন্তব্য পড়া যেতে পারে (দেখুন, সুনান আবু দাউদের ইংরেজি ছাপানো অনুবাদ, ভলিউম ২, হাদিস ২১৫৭ এর মন্তব্য ১৪৮৩, পৃঃ ৫৭৯)।

শারিয়া আইন (ঐ বই) নম্বর এম ৫.৬:
স্ত্রী তার যৌনাঙ্গকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বাধ্য থাকবে—এটা স্বামীর অন্যতম অধিকার। এই জন্য স্ত্রীকে মাসিক স্রাবের পর গোসল নিতে হবে এবং স্বামীর পূর্ণ যৌন

উপভোগ করার জন্য যা যা দরকার তা তাকে করতে হবে। এর মাঝে থাকছে নিয়মিত যৌনাঙ্গের কেশ কামানো, এবং যৌনাঙ্গের ভিতরে জমে যাওয়া ময়লা দূর করা।

স্ত্রীর করনীয় কী?

এক মুসলিম নারীর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও মূখ্য কর্তব্য হবে তার স্বামীর যৌনক্ষুধা নিবৃত করা। আপনার তা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই না? কিন্তু একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝব যে, মোহরানার উদ্দেশ্যই হচ্ছে নারীর যৌনাঙ্গের মালিকানা স্বামীর আয়ত্তে আনা যাতে সে স্ত্রীর দেহকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে। শারিয়ার নিয়ম অনুযায়ী কোনো মুসলিম নারী কস্মিনকালেও তার স্বামীর যৌন ক্ষুধা মেটাতে 'না' বলতে পারবে না। অবশ্য স্ত্রী যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা কোনো কারণে তার যৌনাঙ্গে গোলযোগ দেখা যায়, তখন তা আলাদা।

এখন আমরা দেখব এ ব্যাপারে হাদিস কী বলছে।

সহিহ মুসলিম বই ৮, নম্বর ৩৩৬৬:

আবু হুরায়রা বললেন: আল্লার রসুল (সঃ) বলেছেন যদি কোন রমণী তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাত্রি যাপন করে তবে ফেরেশতারা সেই নারীকে অভিশাপ দেয় ভোরবেলা পর্যন্ত।

এই হাদিসটা অন্যের ভাষ্য দিয়েও বলা হয়েছে—যাতে বলা হয়েছে: যতক্ষণ না স্ত্রী স্বামীর বিছানায় ফিরে আসে।

এ সম্পর্কে সহিহ মুসলিম বই ৮, হাদিস ৩৩৬৭ ও দেখা যেতে পারে।

দেখা যাক, ইমাম গাজ্জালী কী বলেছেন এ প্রসঙ্গে।

এহিয়া উলুম আল-দীন, ভলুম ১ পৃঃ ২৩৫

স্ত্রী তার স্বামীকে নিজের এবং তার আত্মীয়ের চাইতেও বেশি ভালবাসবে। স্ত্রীকে সদা সর্বদা পরিষ্কার ছিমছাম থাকতে হবে যাতে করে স্বামী যখন খুশী তাকে উপভোগ করতে পারে।

ঐ বই, পৃঃ ২৩৬
স্ত্রীকে সর্বদা ন্যায়পরায়ণতা মেনে চলতে হবে। স্ত্রীকে স্বামীর অবর্তমানে দুঃখিত হতে হবে। যখন স্বামী ফিরে আসবে তখন স্ত্রীকে হাসিখুশি দেখাতে হবে এবং নিজের দেহকে প্রস্তুত রাখবে স্বামীর আনন্দের জন্যে।

শারিয়া আইন এম ১০.৪ (উমদাত আল-সালিক, পৃঃ ৫৩৮)
স্ত্রীর গৃহ ত্যাগ করা যাবে না। স্বামীর অধিকার থাকবে স্ত্রীকে গৃহের বাইরে না যেতে দেওয়া। (O. এটা এ কারণে যে বাইহাকী বলেছেন যে রসুলুল্লাহ বলেছেন: যে রমণী আল্লাহ ও কেয়ামতে বিশ্বাস করে সে কখনো তার স্বামীর অবর্তমানে কোন বেগানা লোককে তার গৃহে প্রকাশের অনুমতি দিবে না, অথবা সেই রমণী গৃহের বাইরে যাবে যখন তার স্বামী বিক্ষুব্ধ হবে।

কিন্তু স্ত্রীর কোনো আত্মীয় মারা গেলে স্বামী চাইলে স্ত্রীকে গৃহত্যাগের অনুমতি দিতে পারে।

এখানে হানাফি শারিয়ার একটি নিয়ম ইমাম শাফী দিয়েছেন। সেই আইনটি পড়ে নিন।

শারিয়া আইন (হানাফি) ডবলু ৪৫.২ (ঐ বই পৃঃ ৯৪৯):
স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর সেবা পরিচর্যা করা। এই কর্তব্য স্ত্রীর কাছে ধর্মের অঙ্গ। সেবা বলতে ধরা হচ্ছে রান্না করা, গৃহ পরিষ্কার করা, রুটি বানানো...ইত্যাদি। স্ত্রীর এসব কাজে বিমুখতা পাপ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আদালত স্ত্রীকে জোরপূর্বক এই সব কাজ করতে হুকুম দিতে পারবে না।

স্বামী দ্বারা স্ত্রীকে তালাক দেওয়া (বিবাহবিচ্ছেদ)

ইসলামে বিবাহবিচ্ছেদ খুবই মামুলী ব্যাপার - বিশেষতঃ বিবাহবিচ্ছেদ যদি স্বামী দ্বারা হয়। দু'জন সাক্ষীর সামনে স্বামীকে শুধু বলতে হবে 'তোমাকে তালাক দিয়ে দিলাম।' ব্যস, সেই মুহূর্ত থেকেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে। এই তালাক মৌখিক অথবা লিখিতভাবেও হতে পারে। আজকাল মুঠোফোনেও ইসলামী তালাক দেওয়া জায়েজ হচ্ছে - অনেক ইসলামী দেশেই - হয়ত বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এভাবেই, অতি সহজে, অতি অল্প পয়সা খরচ করে এক নিমেষের মাঝে একজন স্বামী পারবে তার স্ত্রীকে দূর করে দিতে।

শুধু শর্ত হল এই যে, ইদ্দতের (তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী গর্ভবতী কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য) সময় পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ঘরে ভরণপোষণ দিয়ে রাখতে হবে - তাও যদি তালাক এক অথবা দুই হয়। তার মানে হল এই: ইদ্দতের সময় স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে।

কী মারাত্মক ব্যাপার! এক নারীর জীবনের ভার আল্লাহপাক সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়েছেন এক পাষণ্ড স্বামীর হাতে। স্বামীর দয়া, ইচ্ছা, করুণার ওপর নির্ভর করছে এক নারীর অস্তিত্ব। এ চিন্তা করলে ইসলামী সভ্যতা নিয়ে যাঁরা বড়াই করেন, তাঁদের মুখে থুথু দিতে ইচ্ছে করে। এ ব্যাপারে আমি আগেই লিখেছি যে, স্বামী যদি স্থায়ী তালাক দেয় (অর্থাৎ তিন তালাক) তবে স্ত্রীকে এক কাপড়ে ঐ মুহূর্তে স্বামীর ঘর ত্যাগ করতে হবে।

কী নিষ্ঠুর! কী অমানবিক! কী অসভ্য এই ইসলামী আইন, যা আল্লার আইন হিসেবে পরিচিত।

দেখা যাক আল্লাহ পাক কী বলেছেন তালাকের ব্যাপারে।

কোরান সুরা বাকারা আয়াত ২২৮ (২:২২৮):
আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েজ নয়। আর যদি সদ্ভাব রেখে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন সস্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।

ইসলামের এহেন বর্বরোচিত নিয়ম ঢাকার জন্য অনেক ইসলামী পণ্ডিত বলে থাকেন যে, আল্লাহপাকের নিকট তালাক নাকি সবচাইতে অপ্রীতিকর শব্দ। তাই স্বামীর উচিত হবে তালাক একেবারে শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। অর্থাৎ স্ত্রী একান্তই অবাধ্য ও অপ্রীতিকর কর্ম না করলে তাকে তালাক না দেওয়া ভাল। কিন্তু এই ধরনের কথা কোরানের কোথাও লেখা নাই। সুনান আবু দাউদে এই ব্যাপারে দুটো হাদিস দেখা যায়। পড়া যাক এই হাদিসগুলো।

সুনান আবু দাউদ, বই ১২ হাদিস ২১৭২
মুহারিব বর্ণনা করলেন:
নবী বলেছেন (দঃ): আল্লাহ্‌র আইনগত বিধানের মধ্যে তাঁর কাছে সবচাইতে জঘন্য হচ্ছে তালাক।

সুনান আবু দাউদ, বই ১২ হাদিস ২১৭৩
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছে:
নবী (দঃ) বলেছেন: ‘আইনসম্মত কার্য্যকলাপের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে অপ্রীতিকর কর্ম হচ্ছে তালাক।”

এই হাদিসগুলো যে পরিষ্কার ভাবে কোরান লঙ্ঘন করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ ছাড়াও, এই হাদিস শুধু হাস্যকরই নয় - এই হাদিসে আল্লাহ্‌র মতিগতি এবং প্রকৃতিস্থতা নিয়ে সন্দেহ হয়। আল্লাহ্‌ কি পাগল, তাঁর কি মাথাখারাপ? যে কর্মকে আল্লাহ্‌ সবচাইতে জঘন্য বলেছেন, সেই কর্মকেই আল্লাহ্‌ আইনসম্মত করে দিয়েছেন!

চিন্তা করুন: খুন করা যদি সবচাইতে ঘৃণ্য কাজ হয় এবং তা সত্ত্বেও কোনো দেশে যদি খুন করা আইনসম্মত করা হয়, তবে আমরা সেই দেশের আইনকে কী বলবো?

সত্যি বলতে কি ইমাম গাজ্জালী লিখেছেন, কোনো কারণ ছাড়াই স্বামী পারবে স্ত্রীকে তালাক দিতে।

এহিয়া উলুম আল দীন, ভলুম ১, পৃঃ ২৩৪):
স্বামী তার স্ত্রীর ব্যাপার স্যাপার কারও কাছে ফাঁস করবে না—তা বিবাহ অবস্থায় হউক অথবা বিবাহ বিচ্ছেদই হউক। এই ব্যাপারে বেশ কিছু বর্ণনা আছে যে স্ত্রীর গোপন ব্যাপারে কারও সাথে আলাপ আলোচনা বিপদজনক হতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে একদা এক ব্যক্তি জানালো যে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চায়। প্রশ্ন করা হল কি কারণ। সে বলল: “একজন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি তার স্ত্রী সংক্রান্ত গোপন ব্যাপার কাউকে বলে না।” সে যখন তালাকের কাজ সম্পন্ন করল তখন জিজ্ঞাসা করা হল: “তুমি কি কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলে?” সে উত্তর দিল: “আমার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অথবা অন্য কোন নারীর ব্যাপারে কাউকে কিছু বলার অধিকার আমার নাই।”

এ ব্যাপারে শারিয়া বিশেষজ্ঞ আবদুর রহমান ডোইয়ের বক্তব্য হল, হানাফি আইন অনুযায়ী স্ত্রীকে তালাক দেবার জন্য কোনো কারণের দরকার নেই। (ডোই, পৃঃ ১৭৩)

মালিকের মুয়াত্তা হাদিসে লিখা হয়েছে যে, তালাক হচ্ছে পুরুষের হাতে আর মেয়েদের জন্য আছে ইদ্দত।

দেখুন মালিক মুয়াত্তা হাদিস ২৯.২৪.৭০:
ইয়াহিয়া-মালিক-ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ-ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুসায়ত আল লাইথ থেকে বললেন যে সা'দ ইবনে আল মুসায়েব থেকে বর্ণনা করেছেন: উমর আল খাত্তাব বলেছেন: 'কোন স্ত্রীর তালাক হল। তার পর সেই মহিলার দুই অথবা তিন স্রাব হল। এর পর স্রাব বন্ধ থাকল। এমন অবস্থা হলে সেই মহিলাকে নয় মাস অপেক্ষা করতে হবে। এর থেকে বুঝে নিতে হবে যে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী। নয় মাস পার হয়ে যাবার পর আবার তাকে তিন মাসের ইদ্দত করতে হবে। এর পর সে পুনরায় বিবাহে বসতে পারবে।'

ইয়াহিয়া—মালিক—ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ ইবনে মুসায়েব থেকে বলেছেন: "তালাক হচ্ছে পুরুষের হাতে, আর স্ত্রীর জন্যে রয়েছে ইদ্দত"।

মালিকের মুয়াত্তাতে আরও লেখা হয়েছে যে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে যে, সে (স্ত্রী) তার জন্য হারাম, তখন তা তিন তালাক (অর্থাৎ স্থায়ী তালাক) হিসাবে গণ্য হবে।

পড়া যাক মালিকের মুয়াত্তা ২৯.১.৬:
মালিক ইয়াহিয়া থেকে বললেন তিনি শুনেছেন যে আলী বলতেন যে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে যদি বলে: "তুমি আমার জন্যে হারাম", তবে সেটাকে তিন তালাকের ঘোষণা হিসেবে ধরা হবে।

এই সব কিছুর অর্থ হচ্ছে যে, এক মুসলিম পুরুষ যে কোনো মুহূর্তে তার খেয়ালখুশিমত তার হারেমের রদবদল করতে পারবে। সে এক অধিবেশনেই তার চার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে ঘর থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারবে এবং একই সাথে আরও নতুন চারজন স্ত্রী দ্বারা তার হারেম পূর্ণ করে নিতে পারবে।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভাতার ব্যাপারে অনেকেই ইসলামের মাহাত্ম্য দেখাতে চান। এ বিষয়ে আগেই বেশ কিছু লেখা হয়েছে। মোদ্দা কথা হল, অস্থায়ী তালাককে ইদ্দতের সময় ছাড়া অন্য কোনো স্থায়ী তালাকে স্ত্রী স্বামীর কাছ হতে এক কড়ি কণাও পাবে না। এ ব্যাপারে আরও কিছু হাদিস এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভব করছি।

সহিহ্‌ মুসলিম বই ৯, হাদিস ৩৫১৪:
ফাতেমা বিনতে কায়েস অভিযোগ করলেন যে তার স্বামী আল মাখযুলমী তাকে তালাক দিয়েছে কিন্তু কোন খোরপোষ দিতে অস্বীকার করেছে। ফাতেমা আল্লাহর রসুলের কাছে এ বিষয়ে বলল। আল্লাহর রসুল বললেন, "তোমার জন্য কোন ভাতা নাই। তোমার জন্যে ভাল হবে ইবন আল মাখতুমের ঘরে থাকা। সে অন্ধ, তাই তার অবস্থিতিতে তুমি তোমার পোশাক খুলতে পারবে। (অর্থাৎ তার সামনে পর্দা অবলম্বনে তোমার কোন অসুবিধা হবে না।)

সহিহ্‌ মুসলিম বই ৯, হাদিস ৩৫৩০:
ফাতেমা বিনতে কায়েস বললেন: আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিল। আল্লাহর রসুল আমার জন্য কোন প্রকার থাকা খাওয়ার ভাতার ব্যবস্থা করলেন না।

এর পরেও কি আমরা বলতে পারি যে, ইসলামে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের উপর ন্যায়বিচার করা হচ্ছে?

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক দেবার অধিকার

ইসলামীরা প্রায়শঃ গলা ফাটিয়ে বলেন যে, ইসলাম নারীকে দিয়েছে তালাকের অধিকার। কী নিদারুণ মিথ্যাই না তাঁরা প্রচার করে যাচ্ছেন। কথা হচ্ছে, এক মুসলিম স্ত্রী কোনোভাবেই তার স্বামীকে তালাক দিতে পারবে না, যেভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। অর্থাৎ একজন স্ত্রী ইচ্ছে করলেই তার অপব্যবহারমূলক স্বামীর হাত থেকে উদ্ধার পাবে না। তার মুক্তি নির্ভর করবে তার স্বামীর মেজাজের ওপর। একজন স্ত্রী তার কুলাঙ্গার স্বামীকে হাতে-পায়ে ধরে অথবা ইসলামী আদালতে গিয়ে টাকা পয়সা দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। এই ব্যবস্থাকে খুল বলা হয়, তালাক নয়। অন্যায় হচ্ছে এই যে, স্বামীর অবাধ অধিকার আছে স্ত্রীকে কোনো কারণ ছাড়াই যে কোনো মুহূর্তে তালাক দিতে পারে, স্ত্রী তা পারবে না।

এখন কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে বেদম পেটায়, তবুও স্ত্রী পারবে না ঐ অত্যাচারী, বদমেজাজি স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেতে। এমতাবস্থায় পীড়িত স্ত্রীকে ইসলামী আদালতে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, তার স্বামী তাকে এমন ভাবে পিটিয়েছে যা ইসলামী পিট্টির বাইরে পড়ে। অর্থাৎ পেটানো হয়েছে এমনভাবে যে, মহিলাটির হাড় ভেঙ্গে গেছে অথবা প্রচুর রক্তপাত ঘটেছে। এমতাবস্থায় আদালত চাইলে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিতে পারে। কিন্তু শর্ত হবে এই যে, মহিলাকে তার স্বামী যা দিয়েছে (মোহরানা), তা ফেরত দিতে হবে।

মারহাবা! এরই নাম হচ্ছে ইসলামী ন্যায় বিচার। যে ভুক্তভোগী তাকেই জরিমানা দিতে হবে। আর অপরাধী সম্পূর্ণ খালাস। শুধু তা-ই নয় সে পুরস্কৃত হচ্ছে। কী অপূর্ব বিচার! এখন এর সাথে তুলনা করুন আধুনিক বিচার ব্যবস্থার।

দেখা যাক কিছু হাদিস এই খুল সম্পর্কে।

মালিকের মুয়াত্তা ২৯. ১০. ৩২:
ইয়াহিয়া-মালিক-নাফী-সাফিয়া বিনতে আবি ওবায়দের মাওলা থেকে। ইয়াহিয়া বললেন সাফিয়া বিনতে ওবায়েদ তাঁর যা কিছু ছিল সবই তাঁর স্বামীকে দিয়ে দিলেন। এ ছিল তাঁর স্বামী থেকে তালাক পাবার জন্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এতে কোনো আপত্তি জানালেন না।

মালিক বলেছেন, যে স্ত্রী নিজেকে স্বামীর কাছে জিম্মি করে রাখে, সেই স্ত্রীর খুল অনুমোদন করা হয়। এ ব্যবস্থা তখনই নেওয়া হয়, যখন প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীর স্বামী তার জন্যে ক্ষতিকর এবং সে স্ত্রীর ওপর অত্যাচার চালায়। এই সব ব্যাপার প্রমাণ হলেই স্বামীকে তার স্ত্রীর সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে।

মালিক বললেন: এমতাবস্থায় স্ত্রী নিজেকে জিম্মি রেখে (অর্থাৎ স্বামীকে টাকা পয়সা দিয়ে) খুল করে নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে স্ত্রী স্বামীর কাছে যা পেয়েছে, তার চাইতেও বেশি দিতে পারবে।

সহজ কথায়, ইসলামী আইনে বলা হচ্ছে যে, স্ত্রী তার বেয়াড়া স্বামী হতে মুক্তি পেতে চাইলে সবচাইতে সহজ পথ হচ্ছে স্বামীকে প্রচুর টাকা পয়সা উৎকোচ দিয়ে তার থেকে তালাক দাবী করা।

এখন পড়া যাক আরও একটি হাদিস।

সুনান আবু দাউদ বই ১২, হাদিস ২২২০:

উম্মুল মুমিনিন আয়েশা বললেন:
সাহলের কন্যা হাবিবার স্বামী ছিল সাবিত ইবনে কায়েস শিম্মা। সে হাবিবাকে মারধোর করে তার হাড়গোড় ভেঙ্গে দিল। হাবিবা নবীজির (সাঃ) কাছে এ ব্যাপারে স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করল। নবীজি সাবিত ইবনে কায়েসকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: তুমি তোমার স্ত্রীর কিছু জমি জায়গা নিয়ে নাও এবং তার থেকে দূরে থাক। সাবিত বলল: এটা কি ন্যায় সঙ্গত হবে, আল্লাহর রসুল? নবীজি বললেন: হ্যাঁ, তা হবে। তখন সাবিত বলল: আমি স্ত্রীকে দু'টি বাগান দিয়েছি মোহরানা হিসাবে। এই দুই বাগান এখন তার অধিকারে। নবীজি (সা:) বললেন: তুমি ঐ বাগান দু'টি নিয়ে নাও ও তোমার স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও।

কী অপূর্ব ন্যায় বিচারই না করলেন নবীজি! এর থেকে আমরা বুঝলাম যে, স্বামীর অবাধ অধিকার থাকছে স্ত্রীকে তালাক দেবার। স্ত্রীর স্বামীকে তালাক দেবার কোনো অবাধ অধিকার নেই। খুল কোনো অধিকার নয়, খুল হচ্ছে একটি বিশেষ সুবিধামাত্র।

এই ব্যাপারে দেখা যাক কিছু শারিয়া আইন।

শারিয়া আইন এম ১১.৩ (উমদাত আল সালিক, পৃঃ ৫৪৬):
বিবাহ বিচ্ছেদের জন্যে স্ত্রীকে আদালতের বিচারকের শরণাপন্ন হতে হবে।
স্বামী যদি স্ত্রীর জন্য বাধ্য ভরণপোষণ বহন করতে না পারে তখন স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নিতে পারে। এমতাবস্থায় স্ত্রী চাইলে স্বামীর সাথে থাকতে পারে (স্ত্রী নিজের খরচ নিজেই বহন করবে) । স্ত্রী যা খরচ করবে তা স্বামীর দেনা হয়ে থাকবে। স্ত্রী যদি স্বামীর অস্বচ্ছলতা সইতে না পারে, তখনও সে নিজেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। স্ত্রীকে ইসলামী আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে তার স্বামী তার ভরণপোষণ দেয় না। ইসলামী বিচারক যদি স্ত্রীর প্রমাণ গ্রহণ করেন তখনই উনি বিবাহ বিচ্ছেদ (খুল) দিতে পারেন—কেননা এ ব্যাপারে বিচারকই একমাত্র সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। ইসলামী

বিচারক না পাওয়া গেলে স্ত্রী তার বিষয়টা দুজন লোকের (অবশ্যই পুরুষ) হাতে তুলে দিতে পারে।

এখানে অনেক কিন্তু আছে - স্বামী যদি স্ত্রীকে তার মৌলিক খাবার, বাসস্থানের ব্যবস্থা দেয়, তবে স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করতে পারবে না। এই আইনটি লেখা হয়েছে এভাবে।

*শারিয়া আইন এম **১১.৪** (ঐ বই পৃঃ ৫৪৭):*
স্বামী স্ত্রীকে মৌলিক খাবারের ব্যবস্থা দিয়ে থাকলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের পথ নিতে পারবে না। স্বামী যদি প্রধান খাবার দিতে পারে কিন্তু অন্য আনুষঙ্গিক খাবার না দেয়, অথবা চাকর বাকর না দেয় তখনও স্ত্রী পারবেনা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে। এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে স্বামীর সচ্ছলতার উপর।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইসলামী আদালতে গেলে স্ত্রীর সাথে যৌনকর্মের ব্যাপারে আদালত স্বামীর ভাষ্য গ্রহণ করবে, স্ত্রীর ভাষ্য নয়।
*শারিয়া আইন **১১.১১** (ঐ বই পৃঃ ৫৪৬):*

আদালত যৌন সংগম উপভোগের ব্যাপারে স্বামীর সাক্ষ্য, প্রমাণ গ্রহণ করবে।

আদালতে যদি প্রমাণ না করা যায় যে স্বামী স্ত্রীর ভাতা দিতে ব্যর্থ—তখন স্ত্রী যা বলবে এই ব্যাপারে তাই গ্রহণ করা হবে। স্বামী স্ত্রী যদি যৌন উপভোগের ব্যাপারে একমত না হয় তখন স্বামী এ ব্যাপারে যাই বলবে আদালত তাই সত্য বলে মেনে নিবে। অর্থাৎ স্বামী যদি বলে যে স্ত্রী তার দেহদান করতে অপারগ, তখন স্বামীর ভাষ্যই সত্যি বলে গৃহীত হবে। এমন যদি হয় স্বামী স্বীকার করে নিলো যে প্রথমে স্ত্রী তার দেহদান করতে রাজী হল, কিন্তু পরে তার দেহ সমর্পণ করল না তখন স্বামীর ভাষ্য আদালত অগ্রাহ্য করতে পারে।

ওপরের ঐ সব আজগুবি ইসলামী আইন থেকে আমরা সত্যি বলতে পারি যে, একজন স্বামী বিবাহের মাধ্যমে কত সহজেই না নারীদের আর্থিকভাবে ব্যবহার করতে পারে। বিয়ে করার পর স্বামী স্ত্রীর ওপর অত্যাচার শুরু করল, মারধোর করল। যখন এসব অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন স্ত্রী স্বামীর পায়ে ধরল তালাকের জন্য - টাকা-পয়সার বিনিময়ে। স্বামী টাকা নিলো এবং স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল। কী চমৎকার ইসলামী ব্যবস্থা! এই ভাবে সেই স্বামী চালাতে থাকবে তার ব্যবসা। নারীদেহও উপভোগ হচ্ছে, আবার টাকাও পাওয়া যাচ্ছে - এর চাইতে আর ভাল কী হতে পারে?

হিল্লা বিবাহ

এবার আমরা দৃষ্টি দেব ইসলামের আরও একটি বর্বর বিবাহপ্রথার ওপর। অনেকেই হয়ত এ ব্যাপারে কিছু না কিছু জেনে থাকবেন - কারণ গ্রামবাংলায় এই নির্মম ইসলামী প্রথাটি এখনও এই একবিংশ শতাব্দীতেও বহাল তবিয়তে আছে এবং অনেক পরিবারে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই প্রকার:

যখন স্বামী তার স্ত্রীকে ইসলামী পন্থায় স্থায়ী (অর্থাৎ তিন তালাক) দিয়ে দিলো, তারপর সেই স্ত্রী তার ভূতপূর্ব স্বামীর জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যাবে। স্বামী আর কিছুতেই সেই স্ত্রীর সাথে পুনরায় স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না; এমনকি সেই স্ত্রীকে বিবাহও করতে পারবে না। তবে এর মাঝে হেরফের আছে। তা হচ্ছে এই যে, ঐ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিবাহে বসতে হবে। তারপর তাদের মাঝে যৌনসঙ্গম হতে হবে। এরপর এই দ্বিতীয় অস্থায়ী স্বামী মহিলাটিকে তিন তালাক দেবে। মহিলাটি তিন মাসের ইদ্দত করবে এবং যদি সে গর্ভবতী না হয়, তখনই তার ভূতপূর্ব স্বামী তাকে আবার বিবাহ করতে পারবে। যদি মহিলাটি অস্থায়ী স্বামী দ্বারা গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তবে এব্যাপারে ইসলামী কায়দা পালন করতে হবে, যা আগেই লেখা হয়েছে। অনেক ইসলামীই এ ব্যাপারে খুব উৎফুল্লতা প্রকাশ করেন এই বলে যে: দেখুন, ইসলাম কতনা ন্যায় বিচার করছে। এই হিল্লা প্রথা মহিলাকে আরও একটি সুযোগ দিল অন্য স্বামীর ঘর করার। ইসলামীরা এও বলেন যে, এই হিল্লা প্রথার জন্যই পুরুষেরা যত্রতত্র তালাক দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

কিন্তু ইসলামীদের এই সব আবোলতাবোল কতই না হাস্যকর। স্বামী দিল স্ত্রীকে তালাক, কিন্তু তার ভুক্তভোগী স্ত্রীকে কেন আবার বিবাহ করতে হবে এক বেগানা পুরুষকে যদি তার ভূতপূর্ব স্বামী চায় তার পূর্বের স্ত্রীর সাথে একটা সমঝোতা করে নিতে? কিসের বাধা এতে? কেনই বা ভূতপূর্ব স্ত্রীকে আবার যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে অন্য এক পুরুষের সাথে? এটা কি স্ত্রীকে সাজা দেওয়া হল না? এই সাজা তো স্বামীরই পাওয়া উচিত ছিল। কারণ সেই তো তালাক দিয়েছিল।

যাই হোক, আমরা এখন দেখব কোরান ও হাদিস কী বলছে হিল্লা বিবাহ সম্পর্কে।

কোরান সুরা বাকারা আয়াত ২৩০ (২:২৩০):
তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহ্‌র হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হল আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা, যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে, হিল্লা বিবাহে অস্থায়ী স্বামীর সাথে মহিলাকে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতেই হবে। তা না হলে এই হিল্লা বিবাহ সহিহ হবে না। যদি নামকা ওয়াস্তে এই হিল্লা বিবাহ, যা সাধারণত মসজিদের ইমাম অথবা কর্মচারীর সাথে হয়ে থাকে, তবে তা মোটেই সিদ্ধ হবে না। এই আইন যেহেতু কোরানে লিখিত, তাই বিশ্বের কারও সাধ্যি নাই যে এই আইনের রদবদল করে। এর রদের জন্য দুনিয়ার সমগ্র মুসলিম নারীরা জীবন দিয়ে ফেললেও কারও কিছু করার নেই। এটা হচ্ছে এমনই পরিস্থিতি, যেমন হচ্ছে ইসলামী উত্তরাধিকারী আইন—যথা মেয়ে পাবে ছেলের অর্ধেক। এই আইনও চিরকালের। বিশ্বের কোন শক্তি নেই আল্লাহ্‌র এই আইনের পরিবর্তন করতে পারে।

হিল্লা বিবাহের ব্যাপারে দেখা যাক একটি হাদিস।

মালিকের মুয়াত্তা: হাদিস ২৮. ৭. ১৮
ইয়াহিয়া—মালিক—ইয়াহিয়া ইবনে সাইদ—আল কাশিম ইবনে মুহাম্মদ থেকে। ইয়াহিয়া বললেন রসুলুল্লাহর স্ত্রী আয়েশা (রঃ) কে বলা হল: এক স্বামী তার স্ত্রীকে স্থায়ীভাবে তালাক দিয়েছে। সেই স্ত্রী অন্য এক পুরুষকে বিবাহ করল। সেই পুরুষ মহিলাকে তালাক দিয়ে দিল। মহিলাটির আগের স্বামী তার তালাক দেওয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে পারবে কি না? বিবি আয়েশা উত্তর দিলেন ততক্ষণ হবে না যতক্ষণ না সে মহিলাটি ঐ পুরুষটির সাথে যৌন সঙ্গমের মিষ্টি স্বাদ উপভোগ করেছে।

এই হচ্ছে হিল্লা বিবাহের মর্মকথা।

মুসলিম নারীদের যৌনসঙ্গম উপভোগ করার অধিকার আছে কি?

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছে যে, অন্যান্য নারীদের মত মুসলিম নারীদেরও যৌনক্ষুধা রয়েছে এবং সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির প্রয়োজন। কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বড়ই সজাগ এবং অতিশয় কৃপণ। ইসলাম কোনোমতেই চায় না যে, মুসলিম নারীদের দমিত রাখা যৌনক্ষুধা বিস্ফোরিত হোক। তাই তো মুসলিম নারীদের যৌনাঙ্গ ও শরীরের প্রতি এত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হচ্ছে। এই জন্যই মুসলিম নারীর যৌনতার ব্যাপারে এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় - যেন কোনোক্রমেই একজন মুসলিম নারী তার ইচ্ছেমত তার যৌনতা উপভোগ করতে না পারে। সেই জন্যেই না করা হয়েছে কত অমানুষিক বর্বর শারিয়া আইনকানুন, যার একমাত্র কারণ - যেমন করেই হোক, নারীর এই দুর্নিবার ক্ষুধাকে চেপে রাখতেই হবে।

কিন্তু অন্যায় যে আরও ব্যাপক। আমরা দেখেছি, শারিয়া আইন বলছে চাহিবামাত্র স্ত্রীকে তার দেহদান করতে হবে স্বামীকে। কিন্তু এই নিয়মটা স্ত্রী তার স্বামীর ওপর প্রয়োগ

করতে পারবে না। একজন মুসলিম স্ত্রীকে অপেক্ষা করতে হবে, কখন তার স্বামী তার (স্ত্রীর) যৌনক্ষুধা মেটাতে প্রস্তুত - অর্থাৎ স্ত্রী চাইলেই স্বামীর কাছে যৌনসঙ্গম আশা করতে পারবে না। স্ত্রীর তীব্র যৌনক্ষুধা জাগলেও সে তা মুখ ফুটে স্বামীকে জানাতে পারবে না। যৌনউপভোগের একমাত্র নায়ক ও পরিচালক হচ্ছে স্বামী। স্ত্রী হচ্ছে মেঝেতে পড়ে থাকা চাটাই। স্বামী সেই চাটাইয়ে বীর্যপাত করলেই যৌনসঙ্গম সমাপ্ত হয়ে গেল। মোটামুটি এইই হল ইসলামী যৌনসঙ্গম। এখানে নারীর ভূমিকা নিতান্তই নগণ্য - একেবারেই নেই বলা চলে। যেখানে স্বামীকে যৌনসঙ্গমের কত ব্যবস্থাই ইসলাম দিয়েছে, যথা এক সাথে চার স্ত্রী, অসংখ্য যৌনদাসী, অগণিত যুদ্ধবন্দিনী...ইত্যাদি; সেখানে স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে মাত্র একজন পুরুষের ওপর - তার স্বামী, আর কারও ওপর নয়। কোনো মুসলিম নারীর কি এমন বুকের পাটা আছে যে, শারীয়া আইন অমান্য করে তার ইচ্ছামত যৌনক্ষুধা মেটাবে? এই কাজ করলে যে তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে!

আসুন আমরা এখন দেখি শারিয়া আইন কি বলছে মুসলিম নারীদের যৌন ক্ষুধা নিয়ে।

শারিয়া আইন এম ৫.২ (উমদাত আল সালিক, পৃঃ ৫২৫, ইমাম গাজ্জালী হতে):
স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে চার রাতে এক বার। কেননা স্বামীর হয়ত চার বিবি থাকতে পারে। স্ত্রীকে এর জন্য এই দীর্ঘ অপেক্ষা করতেই হবে। যদি সম্ভব হয় তবে স্বামী এর চাইতে অধিক অথবা কম সঙ্গমও করতে পারে। এমন ভাবে স্ত্রীর সঙ্গমের চাহিদা মিটাতে হবে যেন স্ত্রী চরিত্রবতী থাকে, তার যৌন ক্ষুধা আর না জাগে। এর কারণ এই যে, স্বামীর জন্য এটা বাধ্যতামূলক যে তার স্ত্রী যেন সর্বদা চরিত্রাবতী থাকে।

মুসলিম নারীরা কি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে?

বিশ্বের প্রতিটি জীবের স্বাধীনভাবে যত্রতত্র চলার অধিকার রয়েছে। জন্ম থেকেই আমরা সেই স্বাধীনতা ভোগ করে আসছি - ব্যতিক্রম শুধু মুসলিম নারীরা। বিশ্বাস না হলে ঘুরে আসুন কোন এক ইসলামী স্বর্গ থেকে - যেমন সৌদি আরব, ইরান, আজকের ইরাক, আফগানিস্তান, পাকিস্তান... এই সব দেশ। আপনি দেখবেন আমরা যে অধিকারকে জন্ম অধিকার হিসেবে মনে করি, এই সব ইসলামী স্বর্গগুলোতে বসবাসকারী মহিলাদের এই নূন্যতম অধিকারটুকুও নেই। এ কী বর্বরতা! আল্লাহ্ কেন এত নিষ্ঠুরভাবে তাঁরই সৃষ্ট নারীদের বন্দি করে রেখেছেন চার দেওয়ালের মাঝে? আল্লাহ্ কেন এই সব বিদঘুটে নিয়মকানুন পুরুষদের বেলায় প্রযোজ্য করেননি? দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সমস্ত মুসলিম বিশ্ব এই বর্বরতা নীরবে মেনে নিচ্ছে - এর বিরুদ্ধে কোনো টুঁ শব্দটি আমরা শুনি না। আরও অবাকের ব্যাপার হচ্ছে, মুসলিম নারীরা এই সব অসভ্য, বেদুঈন, বর্বরতাকে জোরদার সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। কী পরিহাস! মুসলিম নারীরাই এই জংলী সভ্যতার ভুক্তভোগী, অথচ তারাই নীরবে এই বর্বরতা স্বাছন্দে মেনে নিয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। এইই যদি চলে, তবে কেমন করে একজন মুসলিম নারী পেশাদার কিছু হতে পারবে? ইসলাম যে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, পায়ে বেড়ি লাগিয়ে, সমস্ত শরীরকে কারাগারে পুরে, এবং তার নারীত্বের সমস্ত মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে।

ইসলামী জ্ঞানীগুণীরা অনেক যুক্তি দেখান এই বর্বরতার - যেমন, এ সবই করা হচ্ছে মুসলিম নারীদের মর্যাদা, সম্মান ও নিরাপত্তার জন্য। এই প্রসঙ্গে সর্বদাই বলা হয়ে থাকে: দেখুন, পাশ্চাত্যের নারীরা কি রকম অসভ্য, বেলেল্লাপনা করে বেড়াচ্ছে। তাদের পরনে নামে মাত্র পোশাক, তাদের যৌনাঙ্গ প্রায় উন্মুক্ত। এই সব পাশ্চাত্য বেশ্যাদের তুলনায় আমাদের ইসলামী নারীরা অনেক সুখী, সৌভাগ্যবতী, এবং ধর্মানুরাগী। এইসব শারিয়া আইন করা হয়েছে মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য। এই সব শারিয়া আইন প্রমাণ করে ইসলাম নারীদের কত মর্যাদা দেয়, কত মূল্যবান মনে করে মুসলিম নারীদের। এই সব কত গালভরা কথাই না আমরা অহরহ শুনছি। কী উত্তর দেওয়া যায় ঐ সব অযুক্তি ও কুযুক্তির?

দেখা যাক নারীর প্রতি ইসলামের মর্যাদা দেখানোর কিছু নমুনা।

<u>*ইবনে ওয়ারাকের, আমি কেন মুসলিম নই বই, পৃঃ ৩২১:*</u>
১৯৭০ সালে পাকিস্তানী এক নারীকে হোটেলের চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় যেহেতু মহিলাটি এক পুরুষের সাথে করমর্দন করেছিল। তারপর পাকিস্তানী মহিলাটি বললেন:
"পাকিস্তানে নারী হয়ে বাস করা খুবই বিপদজনক"।

এখন আমরা দেখি, কোরান ও হাদিস কী বলছে এই প্রসঙ্গে।

<u>*কোরান সূরা আন নুর, আয়াত ৩১ (২৪: ৩১):*</u>
ইমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নি-পুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামমুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে

অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগন, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

কোরান সূরা আল আহযাব, আয়াত ৩৩ (৩৩:৩৩)

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে—মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ্‌ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত পবিত্র রাখতে।

সহিহ মুসলিম, বই ৭ হাদিস ৩১০৫:

আবু হুরায়রা বললেন: "রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে নারী আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে কখনই তার মাহরাম ছাড়া এক দিনের ভ্রমণে যাবে না।"

মালিকের মুয়াত্তা, হাদিস ৫৪.১৪.৩৭:

মালিক—সাইদ ইবনে আবি সাইদ আল মাকবুরি—আবু হুরায়রা থেকে। মালিক বললেন: আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলেছেন: যে নারী আল্লাহ ও আখেরতে বিশ্বাস করে তার জন্যে তার পুরুষ মাহরাম ছাড়া একদিনের রাস্তা ভ্রমণ করা হালাল নয়।

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, এমনকি বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মহিলা শ্রমিক বিভিন্ন কল-কারখানায় প্রতিদিন কাজ করতে যায়। এ না করলে তাদের সংসার চলবে না। আমরা ইসলামীদের প্রশ্ন করব: কী হবে ঐ সব মহিলা শ্রমিকদের, যদি তারা শারিয়া আইন বলবত করে? অনেক মহিলা শ্রমিক রাত্রের বেলাতেও ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। তাদের কী হবে ইসলামী আইন চালু হলে? শারিয়া আইনের ফলে এই সব মহিলা শ্রমিক ও তাদের পরিবার যে অনাহারে থাকবে, তা আর বোঝার অপেক্ষা থাকে না। আমরা কি চিন্তা করতে পারি, শারিয়া আইনের ফলে কেমন করে মেঘবতী সুকার্ণপুত্রী (ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি), আমাদের দুই নেত্রী কেমন করে বিদেশে যেতে

পারবেন এবং বিদেশের পুরুষ রাষ্ট্রনায়কদের সাথে এক সাথে বসে আলাপ আলোচনা করবেন? সৌজন্য স্বরূপ পুরুষ রাষ্ট্রনায়কদের সাথে করমর্দনের কোনো কথাই উঠতে পারে না। ইসলামে তা একেবারেই হারাম - ঐ দেখুন ওপরে - এক পাকিস্তানী মহিলার ভাগ্যে কী জুটেছিল। আজকের দিনে আমরা এই বিশুদ্ধ ইসলামী আইনের ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি তালিবানি শাসিত আফগানিস্তানে, উত্তর সুদানে ও নাইজেরিয়ার কিছু প্রদেশে।

একবার ইসলামী আইন চালু হলে মুসলিম নারীদের কপালে যে কী আছে, তা আর বিশেষভাবে লেখার দরকার পড়ে না। শারিয়া আইন নারীদেরকে বেঁধে ফেলবে চতুর্দিক থেকে। মোল্লা, ইমাম, মৌলানা, ইসলামী মাদ্রাসার ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়বে হিংস্র, খ্যাপা কুকুরের মত। দলিত মথিত করে, জবাই করে, টুকরো টুকরো করে এরা খাবে আমাদের মাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, প্রেয়সীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। পাথর ছুঁড়ে এই পাগলা কুকুরগুলো হত্যা করবে আমাদের নারী স্বাধীনতার অগ্রগামীদেরকে। তাকিয়ে দেখুন, কী হচ্ছে আজ ইরানে, ইসলাম শাসিত সুদানে, আফগানিস্তানে, নাইজেরিয়ার উত্তরাঞ্চলে ও অন্যান্য শারিয়া শাসিত ইসলামী স্বর্গগুলিতে।

এখন শুনুন, এক পাকিস্তানী মোল্লা কী বলছে রাওয়ালপিন্ডির মহিলা নেতাদের প্রতি।

ইবনে ওয়ারাকের বই, আমি কেন মুসলিম নই, পৃঃ ৩২১:

আমরা এই সব মহিলাদেরকে সাবধান করে দিচ্ছি। আমরা তাদেরকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব। আমরা ওদেরকে এমন সাজা দিব যে কস্মিনকালে ওরা ইসলামের বিদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না।

বেশ কিছু শিক্ষিত ইসলামী প্রায়শঃ বলে থাকেন যে, ইসলাম নাকি মহিলাদেরকে উচ্চশিক্ষার জন্য আহবান জানায়। ইসলামের লজ্জা ঢাকার জন্যই যে এই সব শিক্ষিত মুসলিম পুরুষেরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের মিথ্যার মুখোশ উন্মোচনের জন্যে আমরা দেখব কিছু শারিয়া আইন। কী বলছে শারিয়া মুসলিম

নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে? শারিয়া সাফ সাফ বলছে যে মহিলাদের জন্য একমাত্র শিক্ষা হচ্ছে ধর্মীয়, তথা ইসলামী দীনিয়াত।

শারিয়া আইন এম ১০.৩ (উমদাত আল সালিক, পৃঃ ৫৩৮):

স্বামী তার স্ত্রীকে পবিত্র আইন শিক্ষার জন্য গৃহের বাইরে যাবার অনুমতি দিতে পারবে। সেটা এই কারণে যে যাতে করে স্ত্রী জিকির করতে পারে এবং আল্লাহ্‌র বন্দনা করতে পারে। এই সব ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য স্ত্রী প্রয়োজনে তার বান্ধবীর গৃহে অথবা শহরের অন্য স্থানে যেতে পারে। এ ছাড়া স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কোন ক্রমেই তার মাহরাম (যে পুরুষের সাথে তার বিবাহ সম্ভব নয়, যেমন পিতা, ভ্রাতা, ছেলে...ইত্যাদি) ছাড়া গৃহের বাইরে পা রাখতে পারবে না। শুধু ব্যতিক্রম হবে হজ্জের ক্ষেত্রে, যেখানে এই ভ্রমণ বাধ্যতামূলক। এ ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভ্রমণ স্ত্রীর জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং স্বামীও অনুমতি দিতে পারবে না। হানাফি আইন অনুযায়ী স্ত্রী স্বামী অথবা তার মাহরাম ছাড়া শহরের বাইরে যেতে পারবে যতক্ষণ না এই দূরত্ব ৭৭ কি: মিঃ (৪৮ মাইল) এর অধিক না হয়।

শারিয়া আইন এম ১০.৪ (ঐ বই, পৃঃ ৫৩৮):

স্ত্রীর ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা।

স্বামীর কর্তব্য হবে স্ত্রীকে গৃহের বাইরে পা না দেবার আদেশ দেওয়া। (O. কারণ হচ্ছে বাইহাকি এক হাদিসে দেখিয়েছেন যে নবী (সাঃ) বলেছেন:

যে মহিলা আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে সে পারবেনা কোন ব্যক্তিকে গৃহে ঢোকার যদি তার স্বামী সেই ব্যক্তির উপর নারাজ থাকে। আর স্বামী না চাইলে স্ত্রী গৃহের বাইরে যেতে পারবে না।)

কিন্তু স্ত্রীর কোন আত্মীয় মারা গেলে স্বামী স্ত্রীকে অনুমতি দিতে পারে গৃহের বাইরে যাবার।

নারীদের উপাসনা করা ও নিজের শ্রী বৃদ্ধির এবং শোক-বিলাপের কতটুকু অধিকার আছে?

পাশ্চাত্যে অবস্থানরত ও পাশ্চাত্যে শিক্ষিত কিছু ইসলামী পণ্ডিত আমাদেরকে সর্বদা শোনাচ্ছেন যে, মুসলিম নারীরা মসজিদে স্বাগতম। ওপরে ওপরে মনে হবে, এ তো খুব চমৎকার - ইসলাম কতই না মহৎ নারীদের প্রতি। যে কথাটি এই সব পাশ্চাত্য শিক্ষিত ইসলামীরা চেপে যান, তা হচ্ছে যে, ইসলাম সব মুসলিম নারীকেই মসজিদে স্বাগতম জানায় না। এস ব্যাপারে কিছু শারিয়া আইন দেখা যাক।

শারিয়া আইন এফ ১২.৪ (ঐ বই, পৃঃ ১৭১):

...নারীদের জন্যে গৃহে উপাসনা (অর্থাৎ নামাজ) করাই উত্তম। (A. তারা তরুণীই অথবা বৃদ্ধাই হউক); একজন তরুণী, সুন্দরী, আকর্ষণীয় মহিলার মসজিদে পা রাখা অপরাধমূলক। (O এমনকি তার স্বামী অনুমতি দিলেও) । যদি তরুণীটি আকর্ষণীয় না হয় তবে তার মসজিদে আসা অন্যায় হবে না। আসল কথা হল তরুণী যেন মসজিদের নামাযীদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। এই জন্যেই আয়েশা (রঃ) বলেছেন: "নবী (সাঃ) যদি দেখে যেতেন আজকালকার মহিলারা কি সব কার্যকলাপ করে তবে উনি নিশ্চয়ই মহিলাদের মসজিদে আসা নিষিদ্ধ করে দিতেন; যেমন করা হয়েছিল বনী ইসরাইলের মহিলাদের।"

এই হাদিসটা বোখারী ও মুসলিম দিয়েছেন।

শারিয়া আইন এফ ২০.৩ (ঐ বই পৃঃ ২১৪):

গ্রহণের সময় নামায। এই সময় নামাযটা দলবদ্ধভাবে মসজিদে পড়া উচিত। যেসব মহিলাদের দেহ আকর্ষণীয় নয় অথবা যারা বৃদ্ধা সেইসব মহিলারাও মসজিদে এই নামায পড়তে পারে। আকর্ষণীয় দেহের মহিলাদের উচিত গৃহের ভিতরে নামায পড়া।

শারিয়া আইন পি ৪২.২ (৩) (ঐ বই পৃঃ ৬৮২):

আল্লাহ ঐ মহিলার প্রতি নযর দিবেন না।

নবী (সাঃ) বলেছেন যে মহিলার স্বামী গৃহে বর্তমান তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর উপবাস (রোজা) রাখা বে আইনি। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কোন ব্যক্তিকে গৃহে ঢুকতে দিতে পারবে না।

এই প্রসঙ্গে মাওলানা আজিজুল হক সাহেব আনুবাদিত বোখারী শরীফে যে মন্তব্য করেছেন তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। উনি বাংলা বোখারী হাদিস নম্বর ৪৮৯ (খণ্ড ১) সম্পর্কে লিখেছেন:

ব্যাখাঃ এই হাদীছ দ্বারা ইমাম বোখারী (রঃ) ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, নারীদের জন্য মসজিদে যাইতেও স্বামীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক ছিল।

মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের আরও একটি ব্যাখা হাদিস নম্বর ৪৯০ প্রসঙ্গে:

ব্যাখ্যাঃ এই হাদিছ দৃষ্টে বোখারী (রঃ) বলিয়াছেন, নারীদের জন্য মসজিদে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করার এবং নামায হইতে দ্রুত বাড়ী প্রত্যাবর্তন করার আদেশ ছিল। এই হাদীছে ইহাও সুস্পষ্ট যে, শুধু মাত্র মসজিদ সংলগ্ন বাড়ী ঘরের নারীরাই মসজিদে আসিত।

সুন্দরী, তরুণীদের মসজিদে ঢোকা উচিত নয় - মেনে নিলাম এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে অন্যান্য নামাযীদের মনোযোগ নষ্ট না করার জন্য। অন্যায়টা হচ্ছে - এই আইন কেন প্রযোজ্য হবে না সুদর্শন দেহের তরুণদের ওপরে? এই সুদর্শন পুরুষদের প্রতি

মহিলারাও যে আকর্ষিত হয়ে পড়তে পারে। এর কারণ কি এই নয় যে, আল্লাহ্ সর্বদাই পুরুষ পছন্দ করেন - কারণ তিনিও যে পুরুষ!

সত্যি কথা হচ্ছে, মোহাম্মদ নিজেই ছিলেন অত্যন্ত যৌনবৈষম্যবাদী মানুষ (sexist), যা হয়ত তখনকার আরব সমাজে বিদ্যমান ছিল। যদিও উনি চাইছিলেন তৎকালীন আরব মহিলাদের ভাগ্যের কিছুটা উন্নতি হোক, তথাপি খুব সতর্ক ছিলেন যাতে আরব সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতায় তেমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন না আনেন। তাই উনি কোনোক্রমেই পুরুষ ও মহিলাদের সমান অধিকারের পক্ষপাতী ছিলেন না। আল্লাহ্‌পাকও এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলেননি।

যত বড় বড় কথাই নবীজি বলুন না কেন, তাঁর মনের গভীরে বাস করত এক অশিক্ষিত, অমার্জিত, বর্বর বেদুঈন আরব। এবং তিনি ভালভাবেই জানতেন বেদুঈন সমাজে মহিলাদের কীভাবে দেখা হয়। বেদুঈনদের কাছে নারীরা হচ্ছে ‘মাল’ অথবা যৌনসম্ভোগের উপকরণ মাত্র। আমরা এই মনোভাবেরই প্রতিফলন দেখি শারিয়া আইনগুলিতে। নবীজি চাইলেও পারতেন না বেদুঈনদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে। আমরা বিভিন্ন হাদিসে দেখি যে, যখনই পুরুষ এবং মহিলার ব্যাপারে নবীজিকে সিদ্ধান্ত দিতে হয়েছে - তিনি প্রায় সর্বদাই পুরুষের পক্ষে রায় দিয়েছেন। এটাই তাঁর বেদুঈন মনের পরিচয়। কারণ মরুভূমির বেদুঈনদের কাছে পুরুষই হচ্ছে সবার ওপরে। নবীজিও তার ব্যতিক্রম হলেন না।

এখানে আরও কিছু হাদিস উদ্ধৃতি দেওয়া হল, যেগুলো থেকে আমরা দেখতে পাব একজন বেদুঈন পুরুষকে তৃপ্ত করতে একজন মহিলার কতদূর পর্যন্ত যেতে হবে।

সহিহ বোখারী, ভলুম ৭, বই ৬২, হাদিস ১৭৩:

জাবির বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, নবী (সাঃ) বলেছেন—যদি তুমি রাত্রে বাড়ী পৌঁছ তবে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর নিকট চলে যাবে না। যাবত না সে যৌনাঙ্গের কেশে ক্ষুর ব্যাবহারে

পরিচ্ছন্ন হয় এবং মাথার কেশ বিন্যাস করে নেয়। নবী (সাঃ) আরও বললেন: "হে জাবির সন্তান উৎপাদন কর, সন্তান উৎপাদন কর!"

মুসলিম নারীদের জন্য প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা, তথা তাদের মুখমণ্ডল সুশ্রী করা একেবারেই হারাম। সত্যি বলতে, যে সব মুসলিম মহিলাগণ নিজেদের সৌন্দর্য বিকাশে ব্যস্ত, তাঁদেরকে মুসলিম নারী বলা যাবে না। তাই বলা যায়, যে সব মুসলিমাহ্ ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে, চক্ষুতে মাসকারা দিয়ে, গালে কুমকুম... ইত্যাদি লাগিয়ে গৃহের বাইরে যান, তাঁদের উচিত হবে, ঐ সব হারাম প্রসাধন সামগ্রী ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তা না করলে এই সব মুসলিমরা যে ইসলামী নরকের আগুনে চিরকাল পুড়তে থাকবেন।

এই ব্যাপারে কিছু হাদিস দেখা যাক।

সহিহ মুসলিম, বই ১, হাদিস ১৮৭:

আবু বুরদা বলেছেন যে আবু মুসা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে আসলো ও উচ্চরবে বিলাপ আরম্ভ করল। যখন আবু মুসা ধাতস্থ হলেন তখন বললেন: তুমি কি জান না? আমি হলপ করে বলছি যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "যে কেউ কারও অসুস্থতায় মস্তক মুণ্ডন করবে, উচ্চরবে কান্নাকাটি করবে ও পোশাক ছিঁড়ে ফেলবে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই।"

সুনান আবু দাঊদ, বই ১, হাদিস ০১৮৮:

আবু হুরায়রা বর্ণনা করলেন:

আল্লাহর সৃষ্ট মহিলাদেরকে মসজিদ যেতে বাধা দিবে না। তবে তাদেরকে মসজিদে যেতে হবে সুগন্ধি না মেখে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, নবীজি পুরুষদেরকে সুপারিশ করেছেন, তারা মসজিদে যাবার সময় যেন সুগন্ধি মেখে নেয়। দেখা যাচ্ছে, একজন সুন্দরী তরুণী, যার আছে আকর্ষণীয়

দেহ, সে ইসলামে এক বিষম বিড়ম্বনার পাত্র। তাকে নিয়ে কী করা? মহিলা যদি বৃদ্ধা, অসুন্দর, ও কুৎসিত দেহের অধিকারী হয়, তবে ইসলামে তার স্থান অনেক উঁচুতে।

দেখা যাক আরও দুই একটি হাদিস।

মালিকের মুয়াত্তা, হাদিস ৫৩.১.২:

ইয়াহিয়া—মালিক—ওহাব ইবনে কায়সান থেকে। ইয়াহিয়া বর্ণনা করলেন:
মোহাম্মদ ইবনে আমর বলেছেন: "আমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে বসেছিলাম। এক ইয়ামানি ব্যক্তি এসে গেল। সে বলল: 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারকাতুহু। এরপর ব্যক্তিটি আরও কিছু বলল। ইবনে আব্বাস (তখন তিনি অন্ধ ছিলেন) জিজ্ঞাসা করলেন: "ব্যক্তিটি কে?" উপস্থিত যারা ছিল তারা বলল: "এ হচ্ছে এক ইয়ামানি ব্যক্তি।" এরপর তারা তার পরিচয় জানিয়ে দিল। ইবনে আব্বাস বললেন: শুভেচ্ছার শেষ শব্দ হচ্ছে—আশীর্বাদ।"

ইয়াহিয়া তখন মালিককে জিজ্ঞাসা করলেন: "আমরা কি মহিলাদেরকে শুভেচ্ছা বা সম্ভাষণ জানাতে পারি?" তিনি উত্তর দিলেন: "এক বৃদ্ধাকে শুভেচ্ছা জানাতে অসুবিধা নাই। তবে এক তরুণীকে আমি শুভেচ্ছা জানাই না।"

মহিলাদের খৎনা করা

এ কেমন কথা! মহিলাদের খৎনা হয় কেমন করে? তাদের যৌনাঙ্গে এমন কিছু কি আছে যা কেটে ফেলা দরকার? - অনেকেই এই প্রশ্ন করবেন। এর সোজা উত্তর হল: হ্যাঁ, মহিলাদেরও খৎনা করতে হবে - এটাই ইসলামী আইন। ঘুরে আসুন মিশর - দেখবেন, প্রায় সমস্ত মহিলাই সেখানে খৎনা করা, যদিও মিশরীয় সরকার দাবী করে যে, এই প্রথার বিরুদ্ধে আইন আছে। কিন্তু কে শোনে যুক্তি, বিজ্ঞান বা আইনের কথা! ঘুরে আসুন ইন্দোনেশিয়া, পৃথিবীর সর্ব-বৃহত্তম ইসলামিক রাষ্ট্র - সেখানে দেখবেন শতকরা নব্বইজন মহিলা খৎনার শিকার। এই একই অবস্থা মালয়েশিয়াতে।

তা হলে বাংলাদেশে কী হচ্ছে? খুব সম্ভবতঃ বাংলাদেশে এই বর্বর বেদুঈন প্রথা নেই। অথবা থাকলেও অত্যন্ত গোপনে তা করা হয়। আর এও হতে পারে যে, বাংলাদেশে যে শারিয়া আইন চালু আছে তা হানাফি আইন। সুন্নিদের মধ্যে হানাফি আইনই একটু কম বর্বরোচিত। হানাফি আইন মতে, মেয়েদের খৎনা করা বাধ্যতামূলক নয়। তাই আমাদের মহিলাদের কিছু রক্ষা।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন মেয়েদের খৎনা করা হবে - ইসলামী আইন অনুযায়ী? এর সরাসরি উত্তর হবে, মেয়েদের যৌন উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য। তা না করলে যে পুরুষদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। পুরুষরা যে পারবে না মেয়েদের যৌন ক্ষুধার চাহিদা

মেটাতে। এই সব বর্বর প্রথাকে সভ্যতার প্রলেপ দিতে অনেক ইসলামী জ্ঞানীরা বলে বেড়াচ্ছেন যে, মেয়েদের খৎনা নাকি তাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভাল। কী ডাহা মিথ্যা কথা!

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মুফতিকে (তাঁর নাম খুব সম্ভবতঃ ফেহমী) একবার এক কাফের মহিলা সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করল: কেন মুসলিম মেয়েদের খৎনা করা হয়? মুফতি ফেহমি সৎ উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, সাধারণত: উষ্ণ দেশের মেয়েদের যৌন তাড়না থাকে অনেক বেশি। তারপর ফেহমি ঐ মহিলা সাংবাদিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন: "তোমার হয়ত এর (মহিলা খৎনা) প্রয়োজন নেই; কিন্তু ঐ মহিলাদের আছে।" আমি স্মৃতি থেকে এই ঘটনাটি বললাম। কেউ সূত্র চাইলে গুগল ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারেন।

এখন দেখা যাক মহিলাদের খৎনা সম্পর্কে ইসলামী আইন কানুন কী বলে।

শারিয়া আইন ই ৪.৩ (উমদাত আল সালিক, পৃঃ ৮৫৯):

খৎনা একেবারে বাধ্যতামূলক। (O. পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যে। পুরুষদের জন্যে খৎনা হবে পুং জননেন্দ্রিয়ের আবরক ত্বক কর্তন করা। মহিলাদের খৎনা হবে ভগাঙ্কুরের আবরক ত্বক ছেদন দ্বারা। এর মানে নয় যে সম্পূর্ণ ভগাঙ্কুর কেটে ফেলা যেটা অনেকেই ভুলবশতঃ বলে থাকেন।) (হানবালিরা বলেন যে মহিলাদের খৎনা বাধ্যতা নয়—সুন্না। হানাফিরা বলে যে মহিলাদের খৎনা শুধুমাত্র স্বামীকে সম্মান দেখানোর জন্যে।)

সুনান আবু দাউদ, বই ৪১ হাদিস ৫২৫১:

উম আতিয়া আল আনসারিয়া বর্ণনা করেন:

মদিনার এক মহিলা মেয়েদের খৎনা করত। নবী (সাঃ) তাকে বললেন: "খুব বেশী কেটে দিবে না। কেননা এতে স্ত্রীর ভাল হবে এবং স্বামীও বেশী মজা পাবে।"

ওপরের আইনগুলো থেকে বোঝা গেল, বাঙালি মহিলারা যদি তাঁদের স্বামীকে সত্যিই ভালবাসেন এবং সম্মান করেন, তবে প্রমাণ স্বরূপ নিজেদের যৌনাঙ্গের খৎনা করে নিতে পারেন। এখানে আমি কিছু বাড়াবাড়ি বলছি না।ইসলামী আইনে যা লেখা আছে, তারই ব্যাখ্যা দিচ্ছি বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে।

মুসলিম মহিলাদের কী ধরনের মৌলিক অধিকার আছে?

ইসলামী আইন অনুযায়ী, একজন মুসলিম পুরুষ একজন ইহুদি অথবা খ্রিষ্টান মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে। এজন্যে মহিলাটির ইসলাম গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয় - যদিও মহিলাটি ইসলাম গ্রহণ করলে ভাল হয়। অনেকে এর সাথে সাবি ও জরথুস্তদের মহিলাদেরও অন্তর্গত করেন। কিন্তু মুসলিম নারীরা কিছুতেই অন্য ধর্মের পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই বিধর্মী পুরুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়। এইই হচ্ছে মুসলিম নারীদের প্রতি ইসলামী ন্যায় বিচার! ইসলামী পণ্ডিতেরা তাই প্রচার করছেন - ইসলাম মহিলাদেরকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে!

দেখা যাক কোরান কী বলে এই ব্যাপারে।

কোরান সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২১ (২:২২১):

আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ্ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আহ্বান করেন

জান্নাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

আচ্ছা মুসলিম মহিলাদের কি অধিকার আছে মিহি ও একটু স্বচ্ছ পোশাক পরার - যেমন নাইটি অথবা নাইলনের সূক্ষ্ম গাউন? ইসলামী আইন অনুযায়ী, একজন মুসলিম মহিলা এমন পোশাক পরতে পারবে না, যাতে তার অন্তর্বাস দেখা যেতে পারে এমনকি তা যদি শোবার ঘরে একান্ত নিভৃতেও হয়। এরকম করলে আল্লাহ্ নাকি নারাজ থাকেন। ভালো কথা - এখানে মহিলাদের একটু সম্ভ্রম-ভাবে রাতের পোশাক পরতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আপত্তি হচ্ছে, এ ব্যাপারে মুসলিম পুরুষদেরকে কিছুই বলা হয়নি। তারা চাইলে শুধুমাত্র জাঙ্গিয়া পরেও ঘুমাতে পারে - আল্লাহ্ তাতে নারাজ হবেন না।

দেখুন, হাদিস কী বলছে।

<u>সহিহ মুসলিম, বই ২৪ হাদিস ৫৩১০:</u>
আবু হুরায়রা বর্ণনা করলেন:
আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) বলেছেন: "নরকের দুই অধিবাসী আমি যাদেরকে দেখিনি—তারা হল সেই সব ব্যক্তি যারা ষাঁড়ের লেজের মত চাবুক দিয়ে ঢোল পিটায় ও সেই সব মহিলারা যারা এমন পোশাক পরিধান করে যে তাদেরকে উলঙ্গই দেখা যায়। এই সব মহিলারা অশুভের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের স্বামীকেও অশুভের দিকে নিয়ে যাবে। এদের মাথা বখত উটের কুজের মত এক দিকে কাত হয়ে থাকবে। এরা স্বর্গে প্রবেশ করবে না বা স্বর্গের সুবাসও গ্রহণ করবে না যদিও স্বর্গের সুবাস অনেক দূর থেকেই পাওয়া যাবে। এরা তা থেকে বঞ্চিত হবে।

আজকের বিশ্বে আমরা এর উদাহরণ সর্বদাই দেখছি। টেলিভিশন খুললেই দেখছি কীভাবে তালিবানরা ইসলাম কায়েম করছে, কীভাবে সুদানে ইসলামী স্বর্গ তৈরি করা হচ্ছে। কীভাবে সোমালিয়ায়, ইরানে, পাকিস্তানে নারীদের প্রতি আচরণ করা হচ্ছে।

চিন্তা করা যায় কি, বোরখার ভেতরে কেমন আরাম আছে? তার ওপর গ্রীষ্মের উত্তাপে? আমরা ১৯৭০-এর দিকে দেখেছিলাম, কেমন করে মাওবাদীরা জোরপূর্বক তাদের নির্দেশিত পোশাক, মাও কোট পরিয়ে দিচ্ছে ছেলে-মেয়ে সবাইকে। এই ব্যাপারে মনে হচ্ছে, ইসলামের সাথে কম্যুনিজমের বেশ মিল পাওয়া যাচ্ছে। উভয়ই স্বেচ্ছাচার ও একনায়কত্ব।

এখন আমরা দেখব মহিলাদের পর্দার ব্যাপারে ইসলামী আইন কী রকম।

শারিয়া আইন এফ ৫.৬ (উমদাত আল সালিক, পৃঃ ১২২):

একজন মহিলাকে তার মাথা ঢেকে রাখতে হবে (খিমার দ্বারা); এছাড়াও শরীরের উপরে ভারি আচ্ছাদন পরতে হবে যা মহিলার সম্পূর্ণ দেহকে ঢেকে রাখবে। (O.কিন্তু এমনভাবে গায়ে জড়াবে না যাতে করে তার দাঁড়ান, উঠা, বসা করতে বাধা আসে অথবা নামায পড়তে অসুবিধা হয়। মহিলাটি নামায পড়ার সময় তিন পোশাকে পড়বে)।

শারিয়া আইন এম ২.৩ (ঐ বই, পৃঃ ৫১২):

অধিকাংশ আলেমদের মতে (n. হানাফিরা বাদে যার বৃত্তান্ত রয়েছে নিম্নের ২.৮ এ) কোন মহিলার পক্ষে মুখমণ্ডল অনাবৃত রেখে গৃহের বাইরে যাওয়া বে আইনি—কোন প্রলোভন থাকুক আর না থাকুক। যখন প্রলোভন থাকে (মহিলার উপর কোন পুরুষের) তখন আলেমরা একমত যে মহিলার মুখমণ্ডল আবৃত থাকতেই হবে। এখানে প্রলোভন বলতে বুঝানো হচ্ছে যৌন সঙ্গমের ইচ্ছা অথবা তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। তবে অগত্যায় পড়লে যদি মহিলার প্রয়োজন হয় তবে সে দৃষ্টি দিতে পারে, যদি প্রলোভনের সম্ভাবনা না থাকে।

শারিয়া আইন ডবলু ৫২.১ (১০৮) (ঐ বই পৃঃ ৯৭৩):

মহিলা পাতলা পোশাক পরতে পারবে না।

মহিলাদের পাতলা পোশাক পরা অপরাধ তুল্য। যে মহিলা পাতলা পোশাক পরে তার দেহের বৈশিষ্ট্য দেখাবে অথবা অন্যের প্রতি হেলে পড়বে অথবা অন্যকে তার দিকে হেলে পড়তে দিবে সেও এই পর্যায়ে পড়বে।

শারিয়া আইন ডবলু ৫২.১ (২৭২) (ঐ বই পৃঃ ৯৮ ৯৯):

মহিলাদের সুগন্ধি পরে গৃহের বাইরে যাওয়া অপরাধ, এমনকি তাতে স্বামীর অনুমতি থাকলেও।

শারিয়া আইন এম ২.৩ (এ) (ঐ বই, পৃঃ ৫১২):

কোন মহিলার বিবাহযোগ্য কোন পুরুষের নিকটে থাকা বে-আইনি। (A.নিজের স্ত্রী অথবা অ-বিবাহযোগ্য আত্মীয় ছাড়া কোন পুরুষের জন্যে অন্য কোন নারীর সাথে একাকী থাকা একেবারেই বে-আইনি। তবে যদি দুই নারীর সাথে পুরুষ একা থাকে তবে তা বে-আইনি হবে না।

মহিলাদের জিহাদে যোগদান

ইসলাম বিশারদরা প্রায়শঃ বলেন যে, মহিলাদের জন্য প্রধান জিহাদ হচ্ছে হজ্জ। এটা সত্যি যে, এ ব্যাপারে কিছু হাদিস আছে (যেমন সাহিহ বোখারী ভলুম ২, বই ২৬, হাদিস ৫৯৫), কিন্তু যে বিষয়টা ইসলামী বিশারদরা চেপে যান তা হচ্ছে ঐ হাদিস অর্ধ সত্য। এই হাদিসের প্রসঙ্গ হচ্ছে এই যে, যখন বিবি আয়েশা জিহাদে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন নবীজি আয়েশাকে বলেছিলেন যে, তাঁর (আয়েশার) জন্যে সবচাইতে ভাল জিহাদ হবে হজ্জ মাবরুর (সিদ্ধ হজ্জ)।

এখন দেখা যায়, অনুবাদকরা তাঁদের ইচ্ছামত ব্রাকেটে (নারীদের জন্যে) জুড়ে দিয়েছেন। বিবি আয়েশা যখন জিহাদে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তখন তিনি নিতান্তই নাবালিকা ছিলেন - তাই নবীজি হয়ত চাননি ঐ অল্প বয়সী মেয়েটা জিহাদে যোগদান করে বেঘোরে প্রাণ হারায়।

আমরা আরও দেখি, কেমন করে এইসব ইসলামী পণ্ডিতেরা, যাঁরা বেশীরভাগই পাশ্চাত্যের দেশে বাস করেন, তাঁদের দ্বৈত ভূমিকা দেখান - অর্থাৎ দুই মুখে কথা বলেন। যখন পাশ্চাত্যে থাকেন, তখন বলেন জিহাদ মানে মানসিক যুদ্ধ করা, নিজেকে উন্নত করার জন্যে, নিজের বিরুদ্ধে নিজেই যুদ্ধ করা। কী সুন্দর কথা! এ কথায় কার না মন ভিজবে! কিন্তু এই ইসলামী পণ্ডিতেরাই যখন ইসলামী স্বর্গে যাবেন, তখন

বলবেন জিহাদ মানে ইসলাম প্রচারের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করা - কাফেরদের হত্যা করে বিশ্বব্যাপী ইসলাম কায়েম করা।

এই ব্যাপারেও আমরা লক্ষ্য করি ইসলামের অন্যায় আচরণ - মহিলাদের ওপর। শারিয়া আইন বলে মহিলাদের জন্যে জিহাদে যোগদান করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু যখন জিহাদে-লব্ধ লুটের মাল ভাগ হবে তখন মহিলা জিহাদিরা কোন নির্দিষ্ট ভাগ পাবে না। তারা শুধু পাবে একটুমাত্র পুরস্কার - এই আর কি।

দেখা যাক শারিয়া আইন এ ব্যাপারে কী বলে।

শারিয়া আইন ও ৯.৩ (ঐ বই পৃঃ ৬০১)

জিহাদ বাধ্যতামূলক (O.ব্যক্তিগতভাবে) সবার জন্য (O.যারা সমর্থ, পুরুষ এবং মহিলা, বৃদ্ধ ও তরুণ) যখন শত্রু মুসলিমদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে।

....একজন মহিলা যে জিহাদে যোগদান করবে, যখন শত্রু চারিদিকে ঘিরে ফেলবে তখন তার কাছে দু'টি সিদ্ধান্ত থাকবে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করা অথবা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করা, যদি মহিলা মনে করে যে আত্মসমর্পণ করলে তার প্রতি কোন অসদাচরণ করা হবে না। কিন্তু যদি মহিলা মনে করে যে আত্মসমর্পণের পরেও সে নিরাপদে থাকবে না, তখন তাকে লড়াই করতেই হবে, সে মহিলা কোনক্রমেই শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে না।

তাহলে আমরা দেখছি যে, মহিলারা জিহাদে যোগদান করতে বাধ্য, এমনকি জিহাদে তারা মৃত্যুবরণও করে নিতে পারে। লক্ষ্য করবেন, আজকাল বেশ কিছু ইসলামী আত্মঘাতী বোমারুরা হচ্ছে মহিলা। এই সকল মহিলারা যে অক্ষরে অক্ষরে শারিয়া আইন মেনে চলেছে, তাতে আমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

এখন আমরা পড়ব নিচের হাদিস, যেখানে মহিলা জিহাদিদের পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। এই হাদিস বেশ লম্বা, তাই প্রাসঙ্গিক অংশটুকুই উদ্ধৃত করা হবে।

সহিহ মুসলিম বই ১৯, হাদিস ৪৪৫৬
ইয়াজিদ বিন হুরমুয বর্ণনা করলেন যে নাজদা একটা পত্র লিখলেন আব্বাসকে পাঁচটা ব্যাপারে।

... আমাকে বলুন আল্লাহ্‌র রসুল (সাঃ) যখন মহিলাদেরকে জিহাদে নিলেন তখন কি রসুলুল্লাহ মহিলাদের জন্য যুদ্ধে-লব্ধ মালের (খুমুস) জন্যে কোন নিয়মিত অংশীদার করেছিলেন? ... ইবনে আব্বাস উত্তরে লিখলেন: ...কখনও কখনও রসুলুল্লাহ মহিলা জিহাদিদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া মহিলা জিহাদিরা আহত যোদ্ধাদের সেবা করত। জিহাদে লব্ধ মালের কিছু পুরষ্কার মহিলারা পেত। কিন্তু রসুলুল্লাহ মহিলাদের জন্য কোন নিয়মিত অংশভাগ রাখেননি।...

যুদ্ধবন্দিনীদের কী অবস্থা?

ইসলামী আইন অনুযায়ী, যে সব কাফের যুদ্ধবন্দিনী ইসলামী সৈন্যদের হাতে বাধা পড়বে, তাদের সাথে ইসলামী সৈন্যরা অবাধ যৌনসঙ্গম করতে পারবে। নবীজির সময় থেকেই এই ব্যবস্থা চলে আসছে। নবীজি নিজেও এই কর্ম করেছেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীর সদস্যদেরকেও এই কর্ম করতে আদেশ দিয়েছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক এক সুন্দরী ইহুদি তরুণী রিহানার। সে অন্য এক ইহুদি ছেলের সাথে বিবাহিতা ছিল। রসুলুল্লাহ বনি কুরায়যা ইহুদিদের আবাসস্থল আক্রমণ করে তাদের ওপর লুটতরাজ চালান এবং তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। এই আত্মসমর্পিত ইহুদিদের প্রতি তিনি তাঁর সুহৃদ সা'দ বিন মুয়াযের বিচারের রায় অনুযায়ী আদেশ দেন সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ইহুদি পুরুষদের গলা কেটে হত্যা করার আর ইহুদি মহিলা ও শিশুদের ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রি করার। নবীজির আদেশ যথাযথ পালন করা হল কিন্তু এই বন্দিনীদের মাঝে তিনি অপূর্ব সুন্দরী যৌনাবেদনময়ী তরুণী রিহানাকে দেখে তার সাথে সহবাস করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তাই রিহানাকে ক্রীতদাসের বাজারে না পাঠিয়ে নবীজি তাকে তুলে নেন আপন বিছানায়। পরে নবীজি রিহানাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তাকে বিবাহের পরামর্শ দিলে রিহানা তা করতে অস্বীকার করে। তাই রিহানা তার জীবন কাটায় রসুলুল্লাহর বিছানায় তাঁর যৌনদাসী হিসেবে। এছাড়াও ইসলামের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে, নবীজি নিজে তাঁর দুই জামাতা আলী ও উসমানকে

উপহার দিয়েছেন সুন্দরী যুদ্ধবন্দিনীদের, যেন তারা ঐ বন্দিনীদেরকে অতিরিক্ত যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এই হল নবীজির নৈতিক চরিত্রের উদাহরণ—যার উদাহরণ ইসলামী চিন্তাবিদরা আমাদেরকে বলেন অনুসরণ করতে।

এরপরেও জুয়েইরার কথা এসে যায়। নবীজি এই অপূর্ব সুন্দরী, বিবাহিতা, অল্প বয়স্কা ইহুদি মেয়েটিকে বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে পেয়ে যান যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে। আরও পেয়েছেন সফিয়াকে খাইবারের যুদ্ধবন্দিনী হিসেবে। এইসব বিষয়ে বেশ কিছু লেখা পড়া যেতে পারে বিভিন্ন জায়গায়। ইসলামী পণ্ডিতেরা এই সব ঘটনায় শুধু দেখেন নবীজির মাহাত্ম্য। তাঁরা বলেন, দেখুন রসুলুল্লাহ কত মহান, উদার, এবং করুণাময় ছিলেন। তিনি ঐ সব অসহায় যুদ্ধবন্দিনীদের বিবাহ করে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। অনেক ইসলামী বিশারদ এই বলেন যে, ঐ সব মহিলারা, যাদের স্বামী, ভ্রাতা ও পিতাদের নবীজি হত্যা করেছেন, তারা নাকি নবীজিকে দেখা মাত্র তাঁর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে। তাই ঐ যুদ্ধ-বন্দিনীদের অনুরোধেই রসুলুল্লাহ তাদেরকে বিবাহ করেন।

কী অপূর্ব কথা আমার শুনছি এই সব ইসলামী মিথ্যাচারীদের কাছ থেকে।

নবীজির এহেন আচরণকে অনৈতিক, নোংরা, জঘন্য ও বর্বরোচিত বলা ছাড়া আর কোনো ভাষা আমরা পাই না।

এই যুগে অনেক উচ্চশিক্ষিত মুসলিম পণ্ডিতেরা বলেন যে, যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে সহবাসের নিয়ম নবীজির সময় ছিল—এখন তা করা যাবে না। কী মিথ্যা কথা-ই না তাঁরা বলে যাচ্ছেন। কারণ কোরান, হাদিস মুসলিমদেরকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছে যে, মোহাম্মদের উদাহরণ প্রত্যেক মুসলিমের অনুসরণ করা বাধ্যবাধকতামূলক। তিনি যেমনভাবে গোসল করেছেন, যেমনভাবে পানি পান করেছেন, যেমনভাবে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন, যেমনভাবে নারীদেহ উপভোগ করেছেন—এই সব কিছুই মুসলিমদের

অনুকরণ করতে হবে। তাই নবীজি যেমনভাবে যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে সহবাস করেছেন, আজকের সমস্ত মুসলিমদের জন্যও তা অবশ্য করণীয়।

রসুলুল্লাহর উদাহরণ থেকে যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করা যে আজও ফরজ, তার সব চাইতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই আমরা বাংলাদেশেই। **১৯৭১** সালে পাকিস্তানী ইসলামী সৈন্যরা বাংলাদেশে গণহত্যা চালায়। এই গণহত্যায় প্রায় তিরিশ লাখ নিরীহ বাঙালি প্রাণ হারায়। এছাড়াও পাকিস্তানী জাওয়ান আমাদের দেশের অগণিত মহিলাদের (তার সংখ্যা হবে আড়াই লক্ষের মত) যুদ্ধবন্দিনী হিসাবে (গনিমতের মাল) ধরে নিয়ে যায়, যৌনউৎপীড়ন চালায় এবং অনেককে যৌনসঙ্গমের পর হত্যা করে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধঅপরাধ বিধি অনুযায়ী এ এক বিশাল অপরাধ এবং এর বিচারে দোষীরা মৃত্যুদণ্ড পেতে পারে। কিন্তু হায়! ইসলামী আইন কী বলছে? ঐ সব ইসলামী সৈন্যরা কোনো অপরাধই করেনি। ওরা যে নবিজীর উদাহরণ পালন করেছে মাত্র।

এখন দেখুন, হাদিস কী বলেছে এ ব্যাপারে।

সুনান আবু দাউদ, বই ১১ হাদিস ২১৫০:
আবু সাইদ আল খুদরি বর্ণনা করলেন: হুনাইন যুদ্ধের সময় আল্লাহ্‌র রসুল আওতাসে এক অভিযান চালালেন। মুসলিম সৈন্যরা তাদের শত্রুকে মোকাবেলা করল এবং তাদেরকে পরাজিত করল। তারা অনেক যুদ্ধবন্দিনী পেল। যুদ্ধবন্দিনীদের কাফের স্বামীরা একই স্থানে থাকার দরুন রসুলুল্লাহর অনেক সাহাবি তাদের হাতে গচ্ছিত বন্দিনী কাফের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করতে বিব্রত বোধ করলেন।

এই সময় আল্লাহ্‌ নাজেল করলেন কোরানের আয়াত ৪:২৪:
এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়—এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তাদের

স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য—ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ্ হবে না। যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সু-বিজ্ঞ, রহস্য-বিদ।

এই আয়াতের মানে পরিষ্কার—মুসলিম সৈন্যরা তাদের হাতে পাওয়া গনিমতের মাল, তথা যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে অবাধ সহবাস করতে পারবে—এমনকি যখন ঐ সব 'মালের' কাফের স্বামীরাও আশেপাশে থাকবে।

দেখা যাক এই হাদিসটা।

সহিহ মুসলিম বই ৮, হাদিস ৩৪৩২
আবু সাইদ আল খুদরি বর্ণনা করলেন:
হুনায়েন যুদ্ধের সময় আল্লাহ্‌র রসুল আওতাসে এক সৈন্যদল পাঠালেন। তারা শত্রুর সাথে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করল। এরপর মুসলিম সৈন্যরা যুদ্ধবন্দি নিলো। মহিলা বন্দিদের সাথে তাদের পৌত্তলিক স্বামীরাও ছিল। নবীজির সাহাবিরা ঐ মহিলাদের সাথে তাদের স্বামীর সামনে সহবাস করতে নারাজ থাকলেন।

এই সময় আল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন এই আয়াত:
এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়—এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম। (৪:২৪)

অনেকেই হয়ত ভাববেন, এই ধরনের যৌনক্রিয়া হয়ত শুধুমাত্র সাধারণ ইসলামী সৈনিকদের মাঝেই সীমিত ছিল। কেননা এরা অনেক দিন যুদ্ধে থাকার কারণে সহবাসের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। ইসলামের যেসব বড় বড় রত্ন আছেন, তাঁরা

কোনোভাবেই এই ধরনের বর্বরোচিত কর্ম করতে পারেন না। কিন্তু দেখুন নিচের হাদিসটা। এই হাদিসে আমরা জানতে পারছি যে, রসুলুল্লাহ তাঁর জামাতা আলীকে যুদ্ধবন্দিনী উপহার দিলেন যৌনউপভোগ করার জন্যে। এই সময় আলী রসুলুল্লাহর কন্যা ফাতেমার সাথে বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? কেউ যখন এই নোংরা ব্যাপারটি নিয়ে প্রশ্ন তুলল, তখন নবীজি এমনও বললেন যে, আলী এর চাইতেও বেশী (অর্থাৎ যৌনসম্ভোগ) পাবার অধিকার রাখে। এই হচ্ছে রসুলুল্লাহর নৈতিক চরিত্রের উদাহরণ।

সহিহ বোখারি, ভলুম ৫ বই ৫৯ হাদিস ৬৩৭:

বুরায়দা বর্ণনা করলেন:

রসুলুল্লাহ আলীকে খালেদের কাছে পাঠালেন খুমুস (যুদ্ধে লব্ধ মাল) নিয়ে আসার জন্যে। আমি আলীকে ঘৃণা করতাম। সে সময় আলী গোসলে ছিলেন (এক যুদ্ধ বন্দিনীর সাথে সহবাস করার পর); আমি খালেদকে বললাম: আপনি কি তাকে দেখলেন (অর্থাৎ আলীকে)? আমরা নবীজির কাছে পৌঁছিলে তাঁকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম। তিনি বললেন: "হে বুরায়দা, তুমি কি আলীকে ঘৃণা কর?" আমি বললাম: "জী হ্যাঁ"; তিনি বললেন: "তুমি তাকে ঘৃণা করছ, তবে সে তো ঐ খুমুস থেকে আরও বেশী পাবার যোগ্য।"

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোনো যুদ্ধবন্দিনী যদি গর্ভবতী থাকে কিংবা জিহাদিদের সাথে সহবাস করার ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তবে তার কী হবে? এ ব্যাপারে ইসলামের উত্তর আছে। নবীজি যুদ্ধ বন্দিনী ধরার পর সেগুলো তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের মাঝে বিতরণ করে দিতেন—নিজের জন্যে খাসা 'মাল'টি রেখে। জিহাদিরা সাধারণতঃ তাদের স্ব স্ব ভাগে পড়া 'মালের' সাথে সহবাস করে ঐ 'মাল'টি মদিনার অথবা নিকটবর্তী ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রি করে নগদ টাকা নিয়ে নিত। 'মাল' কুৎসিত, বৃদ্ধা, মোটা, রুগ্ণা থাকলে অনেক কম দাম পেত। আর 'মাল' যদি গর্ভবতী হত তো সেই মালের

প্রায় কোন মূল্যই থাকত না। তাই জিহাদিরা এমনভাবে তাদের স্ব স্ব 'মালের' সাথে যৌনসংযোগ করতো, যেন 'মাল' গর্ভবতী না হয়ে যায়। সেই যুগে তো আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। তাই জিহাদিদের জন্যে একটি পথই খোলা ছিল—তা ছিল 'আজল'; এই আরবি শব্দের সঠিক বাংলা কি জানা নাই। তবে এর সরাসরি মানে হচ্ছে যোনির বাইরে বীর্যপাত করা। অর্থাৎ চরম পুলকের (orgasm) মুহূর্তে পুংলিঙ্গ যোনির বাইরে এনে বীর্যপাত ঘটান। অনেক জিহাদি আবার এইভাবে অতীব যৌন সুখ উপভোগ করতে পছন্দ করত। কেননা তারা সহজে তাদের স্ত্রীর সাথে এইভাবে যৌন উপভোগ করতে পারত না—ইসলামী আইন বলে যে, স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া 'আ্জল' করা যাবেনা। শুধুমাত্র ক্রীতদাসী অথবা যুদ্ধ বন্দিনীর সাথে 'আজল' করা যাবে কোনো অনুমতি ছাড়াই। আজকের দিনেও এই ইসলামী আইন বলবত থাকছে।

এ ব্যাপারে দেখা যাক কিছু হাদিস।

সহিহ্ বোখারী ভলুম ৫ বই ৫৯ হাদিস ৪৫৯:

ইবনে মুহাইরিয বর্ণনা করেছেন:

আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম এবং আবু সাইদ আল খুদরিকে দেখলাম। আমি তাঁর পাশে বসে পড়লাম। তাঁকে আজল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। আবু সাইদ বললেন: "আমরা আল্লাহ্র রসুলের সাথে বনি মুস্তালিকের যুদ্ধে গেলাম। আমরা আরব যুদ্ধবন্দিনী পেলাম। আমাদের জন্যে কৌমার্য (celibacy) পালন করা অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই আমরা চাইলাম সহবাস করতে। সত্যিই আমরা আজল করতে ভালবাসতাম। তাই আমরা যখন আজল করার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন চিন্তা করলাম: "রসুলুল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, এমতাবস্থায় আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে কি ভাবে আজল করি?" আমরা তাঁকে আজলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন: "তোমাদের জন্যে উত্তম হবে এটা না করা কেননা যা জন্ম হবার তা হবেই।"

সহিহ্ বোখারি ভলুম ৭ বই ৬২ হাদিস ১৩৭:

আবু সাইদ আল খুদরি বর্ণনা করলেন:
এক জিহাদে আমরা শত্রুপক্ষের নারী বন্দি পেলাম। তারা আমাদের হাতে আসলে আমরা তাদের সাথে আজল করে সহবাস করলাম। এরপর আমরা রসুলুল্লাহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: "তাই নাকি! তোমরা কি এরূপ করে থাক?" রসুলুল্লাহ তিনবার এই প্রশ্ন করলেন, এবং বললেন: "আখেরাত পর্যন্ত যত লোক সৃষ্টি হবে তাদের প্রত্যেকটি অবশ্য জন্মলাভ করবে।"

বলা বাহুল্য, ইসলামের এহেন নৈতিক নিম্নতায় অনেক শিক্ষিত ইসলামী বিশারদরা লজ্জিত হয়ে থাকেন। তাই ইসলামের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে অনেক কিছুও বলে থাকেন—যেমন: আমাদের এসব দেখতে হবে স্থান, কাল, ও প্রসঙ্গ ভেদে। অনেকেই বলেন ইসলামকে ভুল বোঝা হচ্ছে, ইসলাম বুঝতে হলে প্রচুর পড়াশোনা করা দরকার, এই ব্যাপারে ইসলামের পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করা দরকার...এই সব কত বিচিত্র যুক্তি। অনেকে এমনও যুক্তি দেখান যে, ঐ সব বন্দিনীদেরও যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি হচ্ছে—তাই মন্দ কী! যখন প্রশ্ন করা হয়—আজকের দিনেও কি ঐ ইসলামী প্রথা মানা যাবে কি না, তখন তাঁরা প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে পছন্দ করেন—হয়ত বা বলবেন: "দেখুন, এ ব্যাপারে ইসলামে ন্যায়সঙ্গত নিয়ম কানুন আছে। তাই ইসলাম যা করবে, তা ভালোর জন্যেই করবে।"

এ ব্যাপারে এক ইসলামী মওলানাকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর পরিষ্কার উত্তর হল, আজকের দিনেও ঐ ইসলামী নিয়ম প্রযোজ্য এবং আজকেও যদি ইসলামী জিহাদিরা কাফের রমণী লাভ করে যুদ্ধবন্দিনী হিসাবে তবে তারা বিনা বাধায় ঐ রমণীদের সাথে সহবাস করতে পারবে।

এই প্রশ্নের উত্তর এই ওয়েব সাইটের দেওয়া হয়েছিল এই পাতায়। ওয়েব সাইটটি সচল থাকলেও সেই পাতাটি, বোধ করি, এখন অচল।

এখন আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল, **১৯৭১** সালে পাকিস্তানি সৈন্যেরা কেন তাদের বাঙালি নারী যুদ্ধবন্দীদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি, বিন্দুমাত্র তাদের বিবেক বিচলিত হয়নি—এ সব তো ইসলামে সিদ্ধ। আর তা ছাড়াও বেশীরভাগ বাঙালিরা তো আসল মুসলমান নয়। তাই তাদের রমণীদের সাথে যদি পাকিস্তানি ইসলামী সৈন্যরা সহবাস করে, তবে তো ঐ সৈন্যরা এক বিশেষ অনুগ্রহ করছে। আর এর ফলে যদি কোন বাচ্চা পয়দা হয় তা তো আল্লাহ্ পাকের অশেষ অবদান। সেই শিশু হবে খাঁটি মুসলিম।

ক্রীতদাসীদের সাথে সহবাস

এই বিষয়টাও আলোচনা করা দরকার। এর আগে আমরা দেখেছি, মুসলিমরা কেমন স্বাচ্ছন্দ্যে যুদ্ধে লব্ধ বন্দিনীদের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এই 'হালাল' পদ্ধতিতে মুসলিমদের অগাধ যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি না হলে তার ব্যবস্থাও ইসলামে আছে। দাসপ্রথা ইসলামে সর্বদাই আছে এবং থাকবে। আপনি গুগল ঘেঁটে দেখবেন যে, অনেক বিশাল বিশাল ইসলামী আলেমরা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, আজও ইসলামে দাস-দাসীর বেচাকেনা চলতে পারে। এইভাবে কোনো ক্রীতদাসী কিনে তার সাথে সহবাস করা একেবারে 'হালাল'।

আসুন, এবার আমরা ইসলামী বই ঘেঁটে কিছু মজার ব্যাপার জেনে নেই।

মালিকের মুয়াত্তা হাদিস ২.২৩.৯০:

ইয়াহিয়া—মালিক—নাফি থেকে। ইয়াহিয়া বললেন যে আবদুল্লাহ ইবনে উমরের ক্রীতদাসীরা তাঁর পা ধৌত করতো এবং তাঁর কাছে খেজুর পাতার তৈরি এক মাদুর নিয়ে আসত। সে সময় তারা ঋতুমতী ছিল।

মালিককে জিজ্ঞাসা করা হল কোন এক ব্যক্তি গোসল করার আগেই কি তার সব ক্রীতদাসীদের সাথে যুগপৎ সহবাস করতে পারবে? তিনি (অর্থাৎ মালিক) উত্তর দিলেন যে গোসল ছাড়াই পরপর দুইজন ক্রীতদাসীর সাথে সহবাসে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু যখন কোন স্বাধীন স্ত্রীর সাথে সহবাসের দিন থাকবে সেদিন অন্য আর এক স্বাধীন

স্ত্রীর সাথে যৌন সঙ্গম করা যাবে না। কিন্তু এক ক্রীতদাসীর সাথে যৌন সঙ্গমের পর সাথে সাথে অন্য ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস করা আপত্তিকর নয়—যদিও তখন লোকটি জুনুব (সহবাসের পর তার কাপড়ে অথবা দেহে বীর্য ও অন্যান্য কিছু লেগে থাকা)।

এরপর মালিককে জিজ্ঞাসা করা হল। এক ব্যক্তি সঙ্গম করল এবং জুনুব হয়ে গেল। তার কাছে পানি আনা হল গোসলের জন্য। সে ভুলে গেল গোসল করতে। পানি উত্তপ্ত না শীতল তা জনার জন্যে সে তার আঙ্গুল ডুবিয়ে দিল পানির মাঝে।" মালিক উত্তর দিলেন: "তার আঙ্গুলে যদি কোন ময়লা না থাকে তবে আমার মনে হয় না ঐ পানিকে দুষিত বলা যাবে।"

নিচের হাদিসে আমরা জানব যে, খলীফা উমর দ্বারা নিষিদ্ধ করার আগে কী জঘন্য কায়দায় এক ক্রীতদাসী ও তার কন্যার সাথে যুগপৎ সহবাস করা হত। ঐ ধরনের সহবাস করা যায় দুই ক্রীতদাসীর সাথে, যারা সহোদরা ভগ্নী।

মালিকের মুয়াত্তা হাদিস ২৮.১৪.৩৩:

ইয়াহিয়া—মালিক—ইবনে শিহাব—ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ—ইবনে উতবা ইবনে মাসুদ—তাঁর পিতা থেকে। ইয়াহিয়া বর্ণনা করলেন: উমর আল খাত্তাবকে জিজ্ঞাসা করা হল: এক ব্যক্তির কাছে এক ক্রীতদাসী ও ক্রীতদাসীর কন্যা আছে। এখন ঐ ব্যক্তি কি পারবে ক্রীতদাসী ও তার তার কন্যার সাথে পরপর সহবাস করতে? উমর বললেন: "আমি এ রকম করা পছন্দ করি না।" এর পরে উমর এই প্রথা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

মালিকের মুয়াত্তা হাদিস ২৮.১৪.৩৪:

ইয়াহিয়া—মালিক—ইবনে শিহাব—কাবিসা ইবনে দুবায়েব থেকে।

ইয়াহিয়া বর্ণনা করলেন:

এক ব্যক্তি উসমানকে জিজ্ঞাসা করল: এক ব্যক্তির কাছে দুই সহোদরা বোন আছে ক্রীতদাসী হিসাবে। ঐ ব্যক্তি কি এই দুই ভগিনীদের সাথে যুগপৎ সহবাস করতে

পারবে? উসমান উত্তর দিলেন: "এক আয়াতে বলা হয়েছে এই প্রথা হালাল; অন্য আয়াতে বলা হয়েছে হারাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই ভাবে সহবাসের পক্ষপাতী নই।" ব্যক্তিটি উসমান থেকে বিদায় নিলো। তার পর সে রসুলুল্লাহর এক সাহাবির সাথে দেখা করল এবং ঐ একই প্রশ্ন রাখল। সাহাবি উত্তর দিলেন: "আমার জানা মতে কেউ যদি এমন সহবাস করে তবে তাকে আমি দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিব।"

ইবনে শিহাব বললেন: "আমার মনে হয় উনি (সাহাবি) ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব।"

মালিকের মুয়াত্তা হাদিস ২৮.১৫.৩৮:

ইয়াহিয়া—মালিক—ইবরাহিম ইবনে আবি আবলা—আবদ আল মালিক ইবনে মারোয়ান থেকে।

ইয়াহিয়া বর্ণনা করলেন:

ইবনে মারোয়ান তাঁর এক বন্ধুকে এক ক্রীতদাসী দিলেন। পরে ইবনে মারোয়ান বন্ধুকে ক্রীতদাসী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। বন্ধু উত্তর দিলেন: আমি চাচ্ছিলাম ক্রীত দাসীকে আমার ছেলের হাতে দিবো যাতে ছেলেটি তার সাথে যেমন খুশী তাই করতে পারে।" আবদ আল মালিক বললেন: "মারোয়ান আপনার চাইতে অনেক বিবেকবান ছিলেন। তিনি তাঁর এক ক্রীতদাসী তাঁর ছেলেকে দিলেন এবং বললেন: "তুমি এই দাসীর ধারে কাছে যাবে না, কেননা আমি তার উন্মুক্ত পা দেখেছি।"

মালিকের মুয়াত্তা হাদিস ২৯.১৭.৫১:

ইয়াহিয়া—মালিক—নাফি থেকে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন:

কোন ব্যক্তি যদি তার ক্রীতদাসকে বিবাহ করার অনুমতি দেয়, তবে তালাকের ভার থাকে ক্রীতদাসের হাতে। এ ব্যাপারে কারো কোন কিছু বলার অধিকার থাকবে না।

এক ব্যক্তি যদি তার ক্রীতদাসের কন্যা অথবা তার ক্রীতদাসীর কন্যা নিয়ে নেয় তবে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।

মালিকের মুয়াত্তা হাদিস ২৯.৩২.৯৯:

ইয়াহিয়া—মালিক—দামরা ইবনে সাইদ আল মাজনি—আল হাজ্জাজ ইবনে আমর ইবনে গাজিয়া থেকে:

উনি (অর্থাৎ আল হাজ্জাজ) জায়েদ ইবনে সাবিতের সাথে বসে ছিলেন। এই সময় ইয়ামান থেকে ইবনে ফাহদ আসলেন। ইবনে ফাহদ বললেন: "আবু সাইদ! আমার কাছে ক্রীতদাসী আছে। আমার কোন স্ত্রীই এই ক্রীতদাসীদের মত উপভোগ্য নয়। আমার স্ত্রীর কেউই এমন তৃপ্তিদায়ক নয় যে আমি তাদের সাথে সন্তান উৎপাদন করতে চাই। তা হলে কি আমি আমার স্ত্রীদের সাথে আজল করতে পারি?" জায়েদ ইবনে সাবিত উত্তর দিলেন: "হে হাজ্জাজ, আপনি আপনার অভিমত জানান।" আমি (অর্থাৎ হাজ্জাজ) বললাম: "আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। আমরা আপনার সাথে বসি আপনার কাছে কিছু শিক্ষার জন্যে।" তিনি (অর্থাৎ জায়েদ) বললেন: "আপনার মতামত জানান।" আমি বললাম: "ঐ ক্রীতদাসী হচ্ছে তোমার ময়দান। তুমি চাইলে সেখানে পানি ঢাল অথবা তৃষ্ণার্ত রাখ। আমি এইই শুনেছি জায়েদের কাছ থেকে।" জায়েদ বললেন; "উনি সত্যি বলেছেন।"

ইসলামের সবচাইতে গোপন ব্যাপার:

চুক্তি করা বিবাহ (মুতা বিবাহ) বা ইসলামী বেশ্যাবৃত্তি

আমরা আগেই দেখেছি, কেমন করে ইমাম হাসান অগণিত স্ত্রী নিয়েছেন। অনেকে বলেন হাসান নাকি ৩০০-এর বেশি স্ত্রী জোগাড় করেছিলেন। কেমন করে তা সম্ভব হোল? এক ওয়েব সাইটে পড়েছিলাম: "হাসান এক বসাতেই চার স্ত্রীকে বিবাহ করতেন।" এই সাইট থেকে এই তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে অনেক দিন আগে। তবে পাঠকেরা চাইলে অন্য ইসলামী সাইট দেখতে পারেন। এরপর এই চার বিবির সাথে সহবাস করার পর হযরত হাসান আবার এক বসাতেই চারজনকে তালাক দিয়ে দিতেন। এই ভাবেই চলত তাঁর যৌন লীলাখেলা। এই ধরনের অস্থায়ী, স্বল্প মেয়াদী বিবাহকে মুতা বিবাহ বলা হয়। সুন্নিরা এই বিবাহের ঘোর বিরুদ্ধে। কিন্তু শিয়ারা ধুমসে এই বিবাহ করে যাচ্ছে আজকেও।

কিছুদিন আগে সংবাদ পত্রে পড়েছিলাম, ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই খারাপ যে, তথাকার ইসলামী সরকার সরকারিভাবে কিছু কিছু 'উপভোগ' কেন্দ্র (Decency House) স্থাপন করছে, যেখানে একজন পুরুষ (বিবাহিত অথবা অবিবাহিত) কয়েক মিনিটের জন্য একজন মহিলার সাথে বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে স্বল্প কিছু অর্থের বিনিময়ে। এরপর যৌনকর্ম সমাধা হলে ঐ বিবাহ চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। টেলিভিশনে একটা প্রামাণ্য চিত্রেও দেখিয়েছে, কেমন করে ইসলামী বিবাহ আদালতের মোল্লারা

টাকার বিনিময়ে এই ধরণের বিবাহ লিখছে। যাই হোক এর নাম হচ্ছে মুতা বিবাহ। এর স্থায়িত্ব কয়েক মিনিট থেকে কয়েক বছর হতে পারে।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এই ব্যবস্থা ইসলামী বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়; এবং ইরানের ন্যায় যে সব 'উপভোগ' কেন্দ্রে এই ধরণের বিবাহ হয়, তা ইসলামী গণিকালয় ছাড়া আর কিছু নয়। হাদিস থেকে আমরা জানি যে, রসুলুল্লাহ এই ধরনের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন উনার সৈন্যদের জন্য যারা জিহাদ করতে গিয়ে যৌনক্ষুধায় কাতর ছিল। পরে খলীফা উমর এই বিবাহ নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু এই ব্যাপারে অনেক মতভেদাভেদ আছে। কে সঠিক আর কে বেঠিক, তা নির্ণয় অতিশয় দুরূহ। তাই ইসলামী বিশ্ব আজও এই ব্যাপারে দুই ভাগে বিভক্ত।

দেখা যাক, কোরনে কীভাবে মুতা বিবাহ লেখা হয়েছে।

কোরান সূরা আন নিসা, আয়াত ৪:২৪

এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ; তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়—এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য—ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ্‌ হবে না। যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সু-বিজ্ঞ, রহস্য-বিদ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মুতা বিবাহের জন্য কী পরিমাণ অর্থ লাগতে পারে?

উত্তর পাওয়া যায় এই হাদিসে।

সহিহ্ মুসলিম, বই ৮ হাদিস ২৩৪৯

জাবির বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন:

আমরা চুক্তি করে (মুতা) বিয়ে করতাম কয়েক মুঠো আটার বিনিময়ে। ঐ সময় আল্লাহ্র রসুল আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন। এই ব্যবস্থা চলতে থাকে আবু বকরের সময় পর্যন্ত। কিন্তু হারিসের ঘটনা শোনার পর উমর এই ধরণের বিবাহ নিষিদ্ধ করে দেন।

নারীরা কি অবলা পশু?

আমাদের দেশে অনেক সময়ই আমরা নারীদের অবলা প্রাণী বলে থাকি। অবলা বলতে আমরা কি বোঝাই? গৃহপালিত গবাদি পশুদের বেলায়ও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাহলে আমরা কি নারীদের গবাদি পশুর মত মনে করি না? আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, নবীজি ঠিক এই শব্দটিই ব্যাবহার করেছেন মুসলিম নারীদের ওপর। নারীদের ব্যাপারে এইই ছিল নবীজির শেষ ভাষ্য। বিদায় হজ্জে নবীজি যে-ভাষণ দেন, তা অনেক ইসলামী পণ্ডিতেরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ, অলৌকিক, বিস্ময়কর বলে থাকেন। এখন দেখা যাক নবীজি সেই ভাষণে কী বলেছেন। ভাষণ অনেক বড় হওয়ার জন্যে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হলো।

এই উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে আল তাবারির ইতিহাস বই থেকে (ভলুম ৯, পৃঃ ১১২ ১১৪)

হে মানবজাতি, এখন তোমরা জেনে রাখ যে তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি তাদেরও অধিকার আছে তোমাদের উপর। তোমাদের স্ত্রীর উপর তোমাদের অধিকার হচ্ছে যে, তারা যেন তোমাদের অপছন্দ কোন ব্যক্তিকে তোমাদের বিছানায় না নেয়। আর তোমাদের স্ত্রীরা যেন প্রকাশ্যে কোন কুকর্ম না করে। যদি তোমাদের স্ত্রীরা এইসব করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন তাদেরকে প্রহার করার। তবে এই প্রহার যেন তীব্র না হয়। নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে, কেননা ওরা হচ্ছে গৃহপালিত পশুদের মত। গৃহপালিত পশুদের মতই

ওরা নিঃস্ব - ওদের নিজের বলে কিছুই নেই। তোমরা নারীদের নিয়েছ আল্লাহ্‌র কাছ হতে আমানত হিসেবে। এরপর তোমরা তাদের দেহ উপভোগ করেছ - যা আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে আইনসিদ্ধ করেছেন। হে মানবকুল, তোমরা আমার কথা শোনো এবং উপলব্ধি করো। আমি আমার বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছি এবং তোমাদের জন্যে যা রেখে গেলাম, তা যদি তোমরা আঁকড়ে থাক তবে কোনোদিন বিপথে যাবে না। তোমাদের জন্যে যা রেখে গেলাম তা হোল আল্লাহ্‌র কিতাব আর তাঁর নবীর সুন্নাহ্‌।

ওপরের বক্তব্যে রসুলুল্লাহ ইসলামে নারীদের অবস্থান ধার্য করে গেছেন পাকাপোক্ত ভাবে - আর তা হচ্ছে: নারীরা গবাদি পশুর মত এবং তাদেরকে মুসলিম পুরুষেরা ঐ ভাবেই ব্যবহার করবে।
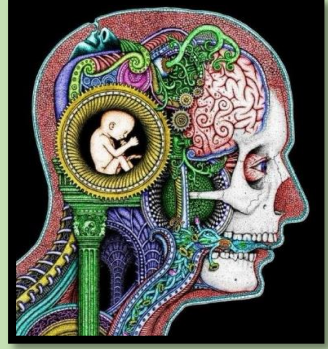
'ইসলামে বর্বরতা: নারী-অধ্যায়' লিখেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ও কিংবদন্তিতুল্য ইছলাম-গবেষক এবং কোরান, হাদিস ও ইছলামের ইতিহাস সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী **আবুল কাশেম**।

ইসলামের মূল বইগুলো, যেখান থেকে উঠে এসেছে ইসলামের আইনকানুন। সেখানে লুকিয়ে রাখা না-বলা দানবীয় দিকটা স্পষ্ট করে আনা হয়েছে এই ইবুকটিতে। নারীর প্রতি ইসলামের আদর-সম্মান শুধু লোক দেখানো, মন-ভোলানো। ওগুলো শুধু গজদন্তের মত হাতীর বাইরের সুন্দর দাঁত; আসলে ইসলামের মুখের ভেতরে লুকিয়ে আছে মেয়েদের চিবিয়ে খাওয়ার জন্য আরও একপাটি শক্তিশালী বিষাক্ত দাঁত।

এই ইবুকটি **আবুল কাশেম**-এর লম্বা সময়ের গবেষণার ফসল!

একটি ধর্মকারী ইবুক

dhormockery@gmail.com
www.dhormockery.com
www.dhormockery.net